• •

সমুদ্রের গভীরতা আর মানুষের মন। দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবৃত। যেখানে বিস্ময় অপরিমেয়, অভিজ্ঞতা অপরিসীম। একটার পর একটা পর্দা সরালে চোখের সামনে অনাবিষ্কৃত দেশ।

আশুবাবুর মন আজ সে-সব অবাক দৃশ্যেরই মুখোমুখি। তাঁর সামনে অনন্ত সমুদ্রের স্বচ্ছ জল আর সহজ মানুষের ভিড়। অথচ এই সমস্ত মুখগুলোর পিছনে ইতিহাসের কি রহস্যময় সঙ্কেত।

বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে, অন্তর্মনের অন্বেষণে নিবিষ্ট সুমথনাথ ঘোষ তাঁর অনন্য প্রচেষ্টায় এ কাহিনীর মাধ্যমে বহুগুণে বর্ধিত ক'রে এক বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

একটি বৃক্ষের বহু মঞ্জরীর শোভার মতো এ-গ্রন্থের চরিত্রগুলি। তাঁরা সমুদ্রের বুকে একে একে লুটিয়ে-পড়া নদীর মতো সহজতায় মিশে গেছে। নামসার্থক উপন্যাসের আঙ্গিকের নিপুণতা ও ভাষার চারুসুষমার জন্যে সুমথনাথ ঘোষ বহু পূর্বেই পাঠকসাধারণের কাছে উল্লেখ্যভাবে সুপরিচিত হ'য়ে খ্যাতিমান হয়েছেন।

ব * হ্নি
ম * ঞ্জ * রী

সু ম থ না থ ঘো ষ
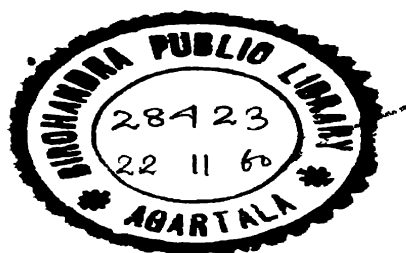
আধুনিক সাহিত্য ভবন

১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৮৮২ শকাব্দ

প্রচ্ছদ রচনা : নরেশ রায়

দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ ন. প.

আধুনিক সাহিত্য ভবন
১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ১২
থেকে বেণুকা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মুদ্রণ ভারতী
১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ১২
থেকে অমলেন্দু ভদ্র কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

আধুনিক সাহিত্য প্রকাশিত

নতুন উপন্যাস

ব হু ম ঞ্জ রী

সমুদ্র মানুষকে ভাবায়। তার চিন্তাকে করে অন্তর্মুখী। যা কিছু সে পায় নি কিংবা পেয়ে যা হারিয়েছে তাকে যেন খোঁজে সে বুকের গভীরে। অতল সমুদ্রের সঙ্গে বুঝি এই এক জায়গায় মানুষের অন্তরের মিল অব্যক্ত হলেও অনস্বীকার্য! তাই তরঙ্গগুলো আছড়ে প'ড়ে বালির তটে যখন বুদ্‌বুদে পরিণত হয় তখন মানুষের বুক থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বুঝি বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস।

তবু সমুদ্রকে যারা সত্যি সত্যি ভালবাসে তারাই পছন্দ করে গোপালপুরের সমুদ্রতীর; এবং এই হোটেলটা। নইলে কার গরজ, দৈনিক দশ টাকা বিল দিয়ে এখানে থাকার? বিশেষ যখন আরো রয়েছে হোটেল এবং অনেক কম খরচে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যে ভালো খাওয়া-দাওয়া মেলে এমন জায়গার অভাব নেই। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ও বিলিতী সাহেবদের কত ছোট বড় বাড়ী—পরিচ্ছন্ন, সমুদ্রমুখী ও সম্পূর্ণ বিলীতি ধরনের আবহাওয়ায় সেখানে 'পেয়িং গেস্ট' হয়ে থাকা যায়, জামাই আদরে।

তবু যে এ হোটেলটায় এত লোক আসে তার একমাত্র আকর্ষণ বোধ হয় ওই সমুদ্র। যদিও সমুদ্রতীরে আরো অনেক হোটেল আছে কিন্তু ঠিক ওরকমটি আর দ্বিতীয় নেই, শুধু বেলাভূমির বালুময় অভ্যন্তরে নয়, এ বাড়ীটা যাকে বলে একেবারে সমুদ্রগর্ভে। এখান থেকে সমুদ্রকে কেবল চোখে দেখা যায় না, কাছে পাওয়া যায়—নিরালায়, একান্ত নিভৃতে, একেবারে নিজের শোবার ঘরে। পল্লীর নববধূর মতো সন্তর্পণে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে যেমন এসে ঘরে ঢোকে, তেমনি আবার বেরিয়ে যায় কখন চুপি চুপি পা টিপে টিপে তা কেউ জানতেও পারে না। তাই এখানে সমুদ্রকে পাওয়ার যত আনন্দ,

হারানোর বেদনা বুঝি তার চেয়েও বেশী—মিলনের চেয়ে বিরহটাই বড়। এ হোটেলের বৈশিষ্ট্য এইখানে।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় এর সব আছে—ডাইনিং হল, লাউঞ্জ, রেডিও, সোফা, কাউচ্, ঘরে ঘরে কার্পেট, টেবিল চেয়ার, বাবুর্চি ও উর্দিপরা বেয়ারার দল—যেমন সব বিলিতী হোটেলেই থাকে এবং ঠিক সময় মতো ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ প্রভৃতি সকলের টেবিলে এসে উপস্থিত হয় তবু যেন সকলের মধ্যে কোথায় একটা অতৃপ্তি কিসের শূন্যতা অব্যক্ত অনুভূতির মতো জেগে থাকে, পাওয়ার মধ্যে না পাওয়ার তৃষ্ণা নিয়ে।

ঘরে ঘরে জ্বলে যে বৈদ্যুতিক আলো তাতে আধুনিক বিলাস ভবনের রোশ্‌নাই ঝিলিক মেরে ওঠে না, কোন এক অজ্ঞাত পল্লীর নিভৃত কুটিরে একাকিনী জেগে থাকা বিরহিনীর দু'টি আঁখির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর রেডিয়োর যন্ত্রে বিলিতী অর্কেস্ট্রার সিম্ফনী ঝনৎকার দিক্‌বিদিক প্রকম্পিত ক'রে তোলে না, তার পরিবর্তে হয় তো কোন ওস্তাদ শিল্পীর বেহালার করুণ রাগিণী, বৈরাগীর একতারার মতো তার কক্ষে কক্ষে গুমরে মরে! এক এক সময় মনে হয় এ হোটেল নয় যেন সত্যিকারের একটা সরাইখানা। এখানে যারা আসে তারাও তা ভাল করে মনে মনে জানে।

কদিন হ'ল আশুবাবু এখানে এসেছেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে এক পাও তিনি অন্য কোথাও যান না। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—সব সময় তাকিয়ে বসে থাকেন সমুদ্রের দিকে। কি দেখেন আর কি বোঝেন তিনিই জানেন! দেখে দেখে যেন তাঁর আশা মেটে না। লোকে বলে, এমন সমুদ্র-পাগল লোক সত্যি দেখা যায় না। ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই, যেখান থেকে সমুদ্রকে ভালভাবে দেখা যায়, সব তিনি শেষ না করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, নানাভাবে

দেখেছেন সমুদ্রের রূপ, তবু যেন পুরনো হয় না তাঁর কাছে এ সমুদ্র ! ছুটি পেলেই ছোটেন কোথাও না কোথাও সমুদ্র তীরে। সমুদ্র দর্শনের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। ওই অনন্ত নীল সমুদ্রের মধ্যে কি রহস্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

এ হোটেলটাই সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে আশুবাবুর। বিলিতী হোটেল বলে যদিও বেশী-বিদেশী লোক ও সাহেব-মেমের ভীড় লেগেই থাকে তবু কোথাও এতটুকু হৈ চৈ বা কোলাহল নেই। সকলের মুখে-চোখে যেন কিসের একটা বিহ্বলতা। ওরি মধ্যে তারা থাকে, খায় দায়, আমোদ-আহ্লাদ করে আবার চলে যায়। কিন্তু তাদের অস্তিত্বের কথা কেউ জানতেই পারে না। কিংবা তাদের মুখের সব কথা মিলিয়ে যায় সামনের ওই অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের কলকল্লোলে। সকলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে যেন একাই বকে চলেছে যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালান্তরে। কি এত ভাব, কি এত ভাষা আছে ওর ওই দিগন্ত বিস্তারিত নীল নয়নে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মুগ্ধ ও অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকেও ক্লান্ত হয় না আকাশের আঁখি ! প্রেমের কি অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকনো আছে ওর ওই অতলস্পর্শী বক্ষে, অনন্তকাল ধরে আকাশের কানে কানে কথা বলেও যার শেষ হয় না।

মানুষ বুঝি তাই দিশেহারা হয়ে যায় এখানে এসে—বাক্যস্ফূর্তি হয় না তার মুখে। যত দেখে তত যেন বিস্ময়ের বোঝা বেড়েই চলে। গভীর উৎকণ্ঠা বুকে চেপে, নিঃশব্দে, রুদ্ধশ্বাসে দিনের পর দিন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ! আশুবাবুর মত সমুদ্র-পাগল লোক, আরো কত আছে, কে জানে !

কিন্তু ওই লীলাময়ী তরঙ্গিণীর সে অনন্ত প্রেমের কতটুকু তারা বোঝে, কি বা জানে ! কখনো তার পূজারিণীর বেশ। যুঁই, বেল, চামেলী ফুলে তরঙ্গের ডালি ভরে এনে উজাড় ক'রে দিয়ে যায়

পুষ্পাঞ্জলি, বেলাভূমির পাদমূলে, পৃথিবী যেখানে যোগাসনে বসেছে বালুচরের গৈরিক অঞ্চল গায়ে দিয়ে।

কখনো বা সে আসে যেন বাসর-শয্যায়। ফুলের মুকুট মাথায় প'রে, ফুলের গহনায় সর্বাঙ্গ সুসজ্জিত ক'রে, হাতে যুঁই ফুলের গোড়ে মালা নিয়ে, তারপর আবার কিসের অভিমানে কে জানে সে মালা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, কুসুমের সাজ পরিত্যাগ ক'রে ছুটে পালায় দূরে, বহুদূরে—সকলের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছোয় না —যেখানে আকাশ দু'বাহু বাড়িয়ে মিলনের প্রতীক্ষায় বসে আছে নিঃশব্দে, তার গভীর আলিঙ্গনের মধ্যে সে নিজেকে যেন বিলিয়ে দেয়, নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দেয়, এক তনু হয়ে অভিন্ন হৃদয় হয়ে যায়।

আবার কখনো বা সে রহস্যময়ী নটীর মতো হাস্যলাস্যভরে— নীলাম্বরীর ঘোমটা ঈষৎ খসিয়ে, মুচকি হেসে, কটাক্ষ হেনে চলে যায় বিদ্যুৎগতিতে। কখনো বা কিশোরী বালিকার মতো সে চপলমতি তরঙ্গের দোলায় দোল খেতে খেতে লুকোচুরী খেলে কার সঙ্গে। আবার কখনো যেন এক উদ্ভিন্নযৌবনা নারী, আপন কস্তুরী গন্ধে উন্মাদিনী হয়ে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। বুঝি যাকে পায় তাকে চায় না—তাই সপ্তসাগর মন্থন ক'রে যেন ছুটে বেড়ায় আপন ইপ্সিত ধনের সন্ধানে।

ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের রূপ বদলায়। তাই এক এক-সময় এই আদি অন্তহীন বিরাট জলরাশির দিকে তাকিয়ে মানুষ শুধু দিশাহারা হয় না, স্তব্ধ হয়ে যায় তার সকল ইন্দ্রিয়। দৃষ্টি তখন বাইরে থেকে অন্তর্মুখে ধাবিত হয়। মনের মাঝে জাগে বুঝি দার্শনিক পুরুষ। চোখের সামনের ওই সমুদ্র তখন যেন নিরবধি কালে রূপান্তরিত হয়, আর তার কাছে নিজের অস্তিত্বকে মনে হয় যেন অযুত নিযুত কোটি তরঙ্গোত্থিত বুদ্‌বুদের একটি কণার মতো।

তখন তরঙ্গের ওই কলতানের মধ্যে যেন সে শোনে বসুন্ধরার স্তব গান। যে আদি জননী সমুদ্রের জঠর থেকে এই পৃথিবী জন্মলাভ করেছিল, তাকে বুঝি আজও ভুলতে পারে নি সে তাই অহরহ তার আরাধনা করে! সমুদ্রের ওই ওঁঙ্কার ধ্বনিতে তারি মন্ত্র।

এক এক সময় একথাও মনে উদয় হয় বুঝি বৃদ্ধা জননী কন্যা বসুন্ধরাকে এত ভালবাসে যে সস্নেহে আজও সপ্তসাগরের বাহু বেষ্টন ক'রে তাকে আলিঙ্গনে ঘিরে রেখেছে। পাছে কেউ তার অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় তার কানে কানে দিনরাত অভয়বাণী শোনাচ্ছে।

আবার কখনো মনে হয় বুঝি ওই সমুদ্র, এক জ্ঞানতপস্বী ঋষির মতো দূর থেকে বসে কল্যাণের বাণী শোনাচ্ছে মানুষের কানে অহোরাত্র।

আশুবাবুর মনের গভীরে এমনি আরো কত কি চিন্তা আসা-যাওয়া করে। বিছানায় শুয়ে, বারান্দায় ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে, ঘরের সামনে বিস্তৃত বালুকারাশির ওপর গালে হাত রেখে তিনি তাই বসে থাকেন নিশ্চল মূর্তির মতো। অদূরে, পায়ের নীচে ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে আছড়ে প'ড়ে, তার শিকড়কণাগুলি ছিটকে এসে লাগে মুখে চোখে, সমুদ্র যেন তাঁকে স্পর্শ ক'রে যায় অদৃশ্য অঙ্গুলি দিয়ে।

এ হোটেলে তিনি-ই একমাত্র বাঙ্গালী নন, আরো দু'চারজন আছে। ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা বেশী হলেও বার্মিজ, গোয়ানিজ ও অপর বিদেশীয় নরনারী দু'চার জনকে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। সকলের মনের অবস্থা বুঝি তাঁরই মতো। সবাই চুপচাপ। এখানে ওখানে চেয়ারে বসে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে গর্জমান সমুদ্রের সুনীল জলরাশির দিকে।

বিরল বসনা তরুণী যুবতীরা যখন সুসজ্জিতা হয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে তখন বৃদ্ধের হাতের কাঁটা চামচও হয়তো থেমে যায়, হয়তো

মুহূর্তে বিদ্যুত খেলে যায় তার নিষ্প্রভ চোখে কিন্তু সে যেন ক্ষণিকের মায়া। সঙ্গে সঙ্গে সাগরের ডাক কানে এলেই সবাই আবিষ্ট হয়ে পড়ে সেই অনন্ত নীলিমার স্বপ্নে। যুবকের পাশে তরুণীরা তাই নিশ্চিন্তে বসে হাড়ের কাটিতে রঙীন পশমের ফুল বুনে যায় যন্ত্র-চালিতের মতো, কেবল তাদের কটি আঙ্গুল সঞ্চালিত হয়, মন বুঝি কোন্ অতলে ডুবে থাকে। যুবকদের কারো বা হাতে একখানা দর্শনের বই খোলা, আবার কারুর আঙ্গুলের ফাঁকে, সিগারেট নিঃশব্দে জ্বলে জ্বলে ছাই হয়!

তিনটে বাজলেই সকলে নামে সমুদ্রে স্নান করতে। সকালে স্নান করে অল্প লোক। যুবক-যুবতীদের সুগঠিত দেহে ব্লু রং-এর সাঁতারু-গেঞ্জী টাইট ক'রে আঁটা, কারো বা মাথায় রঙীন রবারের টুপি, তারা-উদ্বেলিত তরঙ্গের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, তাকে দলিত মথিত ক'রে বীর্যবত্বার পরিচয় দেয় না, ধীরে ধীরে যেন তরঙ্গের বাহু বন্ধনে নিজেকে সঁপে দেয়। কখনো বা বেলাভূমির বক্ষে মাথা রেখে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সমস্ত সত্বা ঢেলে দিয়ে যেন অনুভব করে সাগরের অন্তরাত্মাকে। কখনো বা সারা দেহে তরঙ্গের নীলিমা মেলে তার সোহাগ-চুম্বন-হাসিতে অন্তর ভরে নিয়ে, উঠে আসে যেন বাসর-শয্যা থেকে।

সত্যি ভারী ভালো লাগে আশুবাবুর এই জায়গাটা! এর আব-হাওয়া যেন তার মনকে সব সময় গভীর থেকে আরো গভীরে নিয়ে যায়। এখানকার নারী পুরুষ সবাই যেন একই তীর্থের যাত্রী। দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে হঠাৎ বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—সকলের মুখে-চোখে এমনি এক অনির্বচনীয় ভাব!

এ হোটেলের মালিক এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা। বৃদ্ধার বয়স ষাটের ওপর, কোমরটা ঈষৎ ভাঙ্গা, মাথার চুলগুলো বব্ করা,

জোয়ারের জল সরে গেলে মাটির ওপর যেমন ফাটা ফাটা দাগ দেখা যায়, এর মুখের চামড়া তেমনি নানা রেখায় আকীর্ণ। সব সময় হাতে থাকে জ্বলন্ত সিগারেট। বারান্দা দিয়ে চলবার সময় এমন ভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় যেন সংসারের সারতত্ত্বটুকু তিনি বুঝে ফেলেছেন। ওই ধোঁয়া ছাড়া এ জগৎটা যেন আর কিছু নয়। এমন একটা নিরাসক্ত ঔদাসিন্য তাঁর চোখে-মুখে যেন জীবনের কোথাও কোন বন্ধন নেই।

খাবার টেবিলে বসে এক এক দিন অবশ্য এর পরিচয় খুব ভালো ক'রেই মেলে—তবু কেউ তা নিয়ে অভিযোগ করে না বুড়ীকে। আহার্যের সমস্ত দোষত্রুটি যেন পুষিয়ে দেয় একা ওই সমুদ্র। তাই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বুড়ী বলে, 'আমার এখানে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস কিছুই মেলে না, যতটুকু যেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারি, এনে আপনাদের খেতে দিই।'

এই কথা শুনে বোর্ডাররা যখন খুশি হয়ে ওঠে তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন সে দেখে নেয়। তারপর খুশির পরিমাণ যার যত বেশী সুকৌশলে তার কাছ থেকে তার ট্যাক্স আদায় ক'রে নিতে ছাড়ে না। বুড়ীর এ বিষয়ে খুব সুনাম। লোকের পাশে বিলটা হাতে ক'রে এনে বসে নিজের অতীত জীবনের কাহিনীটা আগে ফাঁদে। বিধবা হয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে একা এখানে এসে, এই হোটেল চালিয়ে তাদের কি ভাবে মানুষ করেছে তার কাহিনী সাড়ম্বরে বিবৃত করে। ছেলে-মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে একটু থেমে বুড়ি সিগারেট আরও বার দুই একসঙ্গে টান দিয়ে নেয়। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যা বলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা সবাই কৃতী সন্তান। এখন ভালো উপার্জন ক'রে যে যার সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে। কেবল বড় ছেলেটি তার বেশী প্রিয়, তাই তাকে

কাছে রেখেছে ব্যবসায়ে সাহায্য করার জন্যে, আর বড় মেয়েটিকে উপস্থিত তার কাছে রেখে জামাই আমেরিকায় চলে গিয়েছে বড় চাকরি নিয়ে। শীঘ্রই এসে সে নিয়ে যাবে মেয়েকে সেখানে!

বুড়ীর বড় ছেলেটি সত্যি খুব ভদ্র ও বিনয়ী। ডাইনিং হলের মুখে, বারান্দার এক কোণে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। আসতে যেতে যখনই আশুবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়, তখনি মৃদু হেসে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। হোটেলের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনো সে একাকী জেগে বসে থাকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। সকলে যখন সমুদ্রতীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসে তখন তাকে দেখা যায় একাকী একটা কুকুরের চেন্ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় দূর থেকে আরো দূরে। ছোট্ট একটা ফ্রক-পরা মেয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে শুধু চলে। আবার রবিবার দিন সবাই যখন ডাইনিং হলে ব্রেক-ফাস্ট খেতে ব্যস্ত তখন কিছু না খেয়ে নিজের হাতে সেই মেয়েটিকে ভালো জামা একটা পরিয়ে নিয়ে বাপ-বেটিতে চলে যায় চার্চে।

বুড়ীর মেয়েটি কিন্তু একটু অন্য ধরনের। কোন কিছুর মধ্যেই সে থাকে না। পরের মতো সব সময় পোষাক-পরিচ্ছদে ফিটফাট থাকে। বোর্ডারদের দলে মিশে তাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট, ডিনার, লাঞ্চ খেয়ে আবার তাদেরি সঙ্গে উঠে চলে যায়। হোটেলের মালিকের যে সে কন্যা, তার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। তার চেহারায়ও বিশেষ কোন জৌলুষ নেই—বলিষ্ঠ পুরুষালী গড়ন, অতিক্রান্ত যৌবনা, তবে ঘসে মেজে মুখে রং মেখে সব সময় তরুণী সেজে থাকে। নির্জন দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় কখনো কোনো পুরুষের পাশে বসে হয়তো অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে, পশমের কাঁটি ঘুরিয়ে অনর্গল কথা ব'লে চলে।

আশুবাবুর পাশের ঘরেই থাকতেন এক খাস ইউরোপীয়ান

মহিলা—তিনটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে-মেয়ে নিয়ে। তাঁর স্বামীর চেহারা অনেকটা বর্মী যুবকের মতো। তামাটে রং, নাকের ওপরের দিকটা ঈষৎ টেপা, একটু বেঁটে ধরনের। ভদ্রলোকের বেশভূষা অতি সাধারণ, চুপচাপ একটা বই বা বিলিতী পত্রিকা হাতে ক'রে ইজি চেয়ারে বসে থাকেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী একেবারে তাঁর বিপরীত। মুহুর্মুহু দামী সিগারেট খান। যেমন বিলাসিনী তেমনি সব সময় মূল্যবান পোশাকে দেহ আবৃত করে রাখেন।

আবার আশুবাবুর ঘরের ঠিক উল্টো দিকে থাকে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণী—নাম মেজি। তার ধরনধারণ অনেকটা সেক্সপীয়ারের নায়িকা জুলিয়েটের মতো তেমনি ভাববিহ্বল চিরবিরহিণী, যেন সব সময়ই উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে।

এই মানুষগুলোর দিকে আশুবাবু সব সময়ই কিন্তু পিছন ফিরে থাকেন। তাঁর মনের অবস্থা বুঝি ভিক্টর হুগোর মতো। মানুষ, জনারণ্যের এক একটা জীবমাত্র। কি আছে তাদের সম্পদ যে তাদের দিকে তাকিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করবেন? তাই অনন্ত রহস্যময় ফেনিল সমুদ্রের লহরীর দিকে তাকিয়ে যেন বিভোর হয়ে থাকেন।

হঠাৎ সেদিন নুলিয়াটা তাঁর সব স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে দিলে। এ হোটেলে সে অনেক দিন ধরে কাজ করছে। বাড়ীঘর এই অঞ্চলেই। এখানকার সাহেব-মেমদের স্নান করায় সে। এই তার পেশা।

আশুবাবুর কাছে বেশী বক্‌শিশ পেয়ে এখন সব ছেড়ে পুরোনো ভৃত্যের মতো তাঁর ফায়ফরমাশ খাটে, আর বাকী সময়টা তাঁর ঘরের বারান্দায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে বসে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না আশুবাবুর স্নানের সময় হয়!

বুড়ী মেমটার কথা উঠতেই একদিন নুলিয়াটা বললে, 'বাবু এত বড় বজ্জাত মেম আর এ অঞ্চলে দু'টি নেই। আমরা গরীব মানুষ—

সাহেবদের স্নান করিয়ে তাদের মালপত্তর বয়ে দিয়ে যে টাকা বক্‌শিশ পাই, তার অর্ধেক অংশ ওই বুড়ী কেটে নিয়ে তবে বাকীটা আমাদের হাতে দেয়। বড় কৃপণ। কেন আপনারা এ হোটেলে আসেন—বুড়ী খেতে দেয় না ভালো ক'রে—সব পয়সা কেবল সিন্দুকে জমা করে।

আশুবাবু দার্শনিক হাসি হেসে বলেন, 'খাওয়ার জন্যে তো এখানে আসি নি বাপু—খাবার অভাব নেই আমাদের কলকাতার শহরে, এখানে আসা শুধু এই সমুদ্র দেখতে।'

নুলিয়াটা তাঁর কথাটার মর্ম ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, 'সমুদ্র তো সব হোটেল থেকেই দেখা যায় হুজুর।'

আশুবাবু এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু দৃষ্টিটা তার দিক থেকে ফিরিয়ে নেন।

নুলিয়াটা কিন্তু তাতেও থামে না, বকেই চলে। বোধ হয় সেদিন পেটে কিছু বেশী পরিমাণে দেশী মাল পড়েছিল। সে বললে, 'এত বড় শয়তানি মেম ও যে সবাই ওর নাম শুনলে ডরায়। অমন সাহেবটাকে জব্দ ক'রে দিলে হুজুর! পুলিস এনেও সে কিছু করতে পারলে না।'

'কোন্ সাহেবকে জব্দ করলে আবার?' আশুবাবু দৃষ্টি ঘুরিয়ে তার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে প্রশ্ন করলেন।

'ওই যে মেয়েটা এখানে পড়ে রয়েছে বাবু—ওর স্বামী ছিল বড় ভালো লোক। কলকাতায় চাকরি করতো, আর মধ্যে মধ্যে ছুটি হ'লে এখানে এসে দু'চার দিন কাটিয়ে যেতো। এদিকে ওই বুড়ী যে তার মেয়েকে দিয়ে টাকা উপার্জন করতো তা তো সে জানতো না! সেই সাহেবকে এখানকার যত নুলিয়া আছে সবাই খুব ভালোবাসতো। কে যেন তার কানে সেই কথাটা তুলে দিলে। কোন খবর না দিয়ে একদিন রাত্রে হঠাৎ সাহেব চলে এল এখানে চুপি চুপি। তারপর বুড়ীর ঘরে গিয়ে বললে, 'কোথায় আমার স্ত্রী শিগ্‌গির বলো?'

'বুড়ী মিথ্যে ক'রে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিস দিয়ে একটা ঘরের দরজা ভাঙতেই একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। লাঠির বাড়ি বেধড়ক মেয়েটাকে ঠেঙ্গিয়ে সেই যে সাহেব চলে গেছে আর আসে নি। পাঁচ-ছ' বছর হয়ে গেছে হুজুর।'

আশুবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু বুড়ি যে আমায় বললে, ওর জামাই আমেরিকায় চাকরি করতে গেছে মেয়েকে তার কাছে রেখে!'

'ও সব ঝুট, হুজুর—আমার এই হোটেলে বিশ বছর হয়ে গেল। বুড়ি যখন এখানে প্রথম আসে তখন ছিল ওর যৌবন। যুদ্ধের সময় কত কাণ্ড ও করেছে গোরা পল্টনদের সঙ্গে, শুধু আমি কেন এখানকার সকলেই তা জানে।'

আশুবাবু কিছু না ব'লে শুধু পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালেন। প্রথম টান দিতে না দিতেই হুলিয়াটা আবার শুরু করলে, 'আর ওই ছেলেটার কীর্তি কি কম! লুকিয়ে বুড়ী এক বিলিতী মেমের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল, খুব খানদানী বড়লোকের ঘরের মেয়ে ছিল সে। প্রতি মাসে তার সিগারেটের খরচা লাগতো দু'শো আড়াই শো টাকা; অথচ ছেলেটা কলকাতায় চাকরী ক'রে রোজগার করতো মোট তিন শো টাকা। তাই একদিন মেয়েটাকে ওর কাছে ফেলে দিয়ে মেমটা চলে গেল বিলেতে এবং সেখানে গিয়ে আবার বিয়ে-থা করেছে। সেও প্রায় বছর আটেকের কথা। ছেলেটা কিন্তু বৌকে বড্ড ভালোবাসতো হুজুর—তাই সে ছেড়ে চলে যাবার কিছুদিন পরেই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। কলকাতায় গিয়ে—বুড়ি অনেক সাহেব ডাক্তার দেখিয়ে, প্রায় দু'বছর ধরে চিকিৎসা ক'রে তবে ছেলেকে সুস্থ ক'রে আনে।'

'।কন্তু বুড়ি তো এ সব কিছু বলে নি আমার কাছে।' ব'লে আশুবাবু সিগারেটের শেষ অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে।

'এসব কেলেঙ্কারীর কথা কি কেউ কাউকে বলতে পারে হুজুর! আমরা এখানকার লোক, তাই সব জানি।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওই ছোট মেয়েটা যে সেদিন আমায় বললে, ওর মা দিল্লীর কোন্ হাসপাতালে নার্সের চাকরী করে!'

'ছোট্ট মেয়ে তো হুজুর, ওকে ওই ব'লে বুঝিয়েছে বুড়িটা। মেয়েটা মার কাছে যাবার জন্যে কান্নাকাটি করে কি না!'

সাত আট বছরের সেই ফুটফুটে মেয়েটির ওপর আশুবাবুর ইতিমধ্যে খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল। যখন তখন সে কুকুরের চেন ধরে তাঁর ঘরের বারান্দায় এসে বসতো। 'আঙ্কেল' ব'লে সম্বোধন ক'রে কত কথা ব'লে যেতো আপন মনে। আপেল খেতে মেয়েটা বড় ভালোবাসতো, তাই বাজার থেকে আপেল কিনে এনে রাখতেন আশুবাবু তার জন্যে। মেয়েটার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তাই আশুবাবুর মন করুণায় ভরে ওঠে।

হুলিয়াটা তার কানে গোঁজা অর্ধভুক্ত পিকাটিকে নিয়ে মুখে দিয়ে বললে, 'হুজুর মেচিস্‌টা একবার দিন তো।'

ঐ পিকাটি ধরাতেই কাঁচা তামাকের উগ্র গন্ধ আশুবাবুর নাকে গিয়ে লাগল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুমাল বার ক'রে মুখের ওপর চেপে ধরে কাশতে লাগলেন। 'আচ্ছা হুজুর, আর খাব না।' ব'লে একসঙ্গে দু'তিনটে টান মেরে বালির ওপর চেপে আগুনটা নিভিয়ে সেটাকে আবার কানে গুঁজে রাখতে রাখতে বললে, 'আমার এ সব কথা সত্যি হুজুর। এতটুকু ঝুট হবে তো আপনার পায়ের জুতি খুলে গালে মারবেন। আমার নাম রাঘু, এ গেরামে জিজ্ঞেস করবেন কি

রকম লোক আমি—হ্যাঁ। কুড়ি বছর আমি এই হোটেলে কাজ করছি। কার খবর না জানি?'

ব'লে আঙ্গুল দিয়ে ওদিকের ঘরটা দেখিয়ে বললে, 'ওই যে খুপ্‌সুরুত ছুঁড়িটা 'মেজি'—ও এই হোটেলে কেন আসে জানেন হুজুর?'

'না। ওতো এখানকার বোর্ডার।'

'হ্যাঁ বোর্ডার-ই্ বলতে পারেন। ছুটি পেলেই ও এখানে চলে আসে—বছরে সাত আটবার আসে। আজ পাঁচ বছর ধরে এইরকম দেখছি—কেন জানেন হুজুর?' বলতে বলতে নিজেই তার জবাব দিলে, 'ও ভালবাসতো এক ছোকরাকে, তাকে নিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে সে ডুবে যায়, আর ফিরে আসে না। এখানের গির্জায়. ওদের বিয়ের সব ঠিক ছিল। ওর ধারণা সে মরে নি—নিশ্চয় একদিন না একদিন আসবে ফিরে, আবার ওদের বিয়ে হবে। আমার কাছেই ওরা স্নান করতো তাই সেই থেকে ওর এমন বিষনজরে আমি পড়ে গেছি হুজুর যে আমায় দেখলে ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু আমার কি দোষ হুজুর? ওরা দু'জনে সাঁতার দিতে দিতে চলে গেল, আমার নিষেধ শুনলে না। তারপর এখানে যত জেলের জাল ছিল, নুলিয়া ছিল, সব আমি সমুদ্রে নামালুম কিন্তু তাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। সবই আমার নসিব হুজুর।' ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার বললে, 'আমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওদের বাড়ীতে একটা নকরী দেবে বলেছিল।'

আশুবাবু সব শুনে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। নুলিয়াটাও মুখ বন্ধ ক'রে নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। একটানা তরঙ্গের গর্জন সে স্তব্ধতাকে যেন আরো থমথমে ক'রে তুললে।

আবার প্রথম কথা বললে নুলিয়াটা। কান থেকে সেই ভুক্তাবশেষ পিকাটুকু নিয়ে মুখে গুঁজে আশুবাবুর কাছে আবার দেশলাইটা

চাইলে। 'একটা ছু'টো টান না দিলে বেশী কথা কইতে পারি না হুজুর। বড় বদ অভ্যাস হয়ে গেছে, দেন্ আর একবার শেলাইটা।'

নিঃশব্দে সে কয়েকটা টান দিলে, আশুবাবু তাকে প্রশ্ন করলেন, 'এছাড়া তুমি আর কি কাজ কর ?'

'কি আর করবো হুজুর ? ছুটো ছেলে আছে, তারা মাছ ধরে সমুদ্রে। কোন দিন পায়, কোনদিন শূন্যহাতে বাড়ী ফেরে। তাতে সকলের পেটের ভাতটাও একবেলা হয় না।' ব'লে একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লে। 'আগে আমি একাই ছিলুম এ হোটেলের হুলিয়া। এখন হয়েছে সাত জন—কাজেই যে যেমন ক'রে পারে রেট্ কমিয়ে ছু'টা রোজগারের চেষ্টা করে। ভালো ভালো সাহেব সব আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। নইলে আমার ভাবনা কি ছিল ? আপনার পাশের ঘরের ওই যে মেমসাহেব—ও ফি বছর আসে এখানে বিলেত থেকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ন'নম্বর দশ নম্বর ছুটো ঘর নিয়ে পুরো ছু'টা মাস এখানে থেকে আবার বিলেতে ফিরে যায়।'

'সে কি ! বিলেত থেকে এখানে আসে হাওয়া খেতে ?' আশুবাবুর কণ্ঠ বিস্ময়ে ভরে ওঠে।

'শুধু কি হাওয়া খেতে আসে হুজুর ? আসে প্রাণের টানে। ওই যে ওর সাহেবকে দেখছেন, উনি বাঙ্গালী। বিলেতে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে ওর ঘরে ছিল এবং সেই সময় ওর তিনটি ছেলে-মেয়ে হয়। তারপর ডাক্তারী পাশ ক'রে—সেখান থেকে বড় একটা চাকরী জোগাড় ক'রে দেশে পালিয়ে আসে। এখানে যে বিয়ে-করা স্ত্রী রেখে বিলেত গিয়েছিল সে কথাটা মেমের কাছে গোপন রেখেছিল। মেমটার এক আত্মীয় কলকাতায় চাকরি করতো, সে পরে সব খোঁজ-খবর নিয়ে ওকে জানায়। কিছুদিন পরে এই নির্জন হোটেলে বৌকে নিয়ে ডাক্তার সাহেব যখন হাওয়া খেতে এলেন হঠাৎ একদিন মেমসাহেব

তিনটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে একেবারে বিলেত থেকে উড়ে এখানে এসে হাজির হ'ল। তারপর হাতে হাতে সব ধরা পড়ে যেতে উভয়-পক্ষের সম্মতিক্রমে এই স্থির হয় যে প্রতি বছর দু'টা মাস ক'রে মেমসাহেব বিলেত থেকে এখানে আসবে এবং স্বামীর সঙ্গে দেখাশুনা ক'রে চলে যাবে। এর দরুন যাতায়াতের সব খরচা ডাক্তার সাহেবকে বহন করতে হবে। মেমটা বড় ভালো হুজুর। ডাক্তারের বৌকে কত ভালবাসে! প্রতি বছর বিলেত থেকে ভালো ভালো উপহার নিয়ে আসে তার জন্যে। বৌটাও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে এখানে আসে, কয়েকটা দিন থেকে সেইসব উপহার নিয়ে একা চলে যায় কলকাতায়, ডাক্তারকে এখানে রেখে যায়। এই তো হুজুর, আপনি আসবার আগের দিন তাকে কলকাতার গাড়িতে মেমসাহেব নিজে তুলে দিয়ে এল।'

এই ব'লে নুলিয়াটা চুপ করলো বটে কিন্তু আশুবাবুর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না। তিনি শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তেমনি তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। তাঁর চোখের সামনে সেই অনন্ত নীল সমুদ্র তেমনি ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে বেলাভূমির ওপর আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু আশুবাবু—তাঁর চোখের সামনে তখন আর এক নতুন জগত এসে দাঁড়িয়েছে—তাঁর মন বুঝি তখন ডুবে গেছে এমন এক সমুদ্রে যার রহস্য আরো গভীর, আরো অন্তস্পর্শী আরো বৈচিত্র্যময়।

সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আশুবাবু এই প্রথম তাঁর দৃষ্টিটা সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে হোটেলের দিকে প্রসারিত করলেন।

আশুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। নুলিয়াটাও সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিসের চিন্তা যেন তাকে গভীর থেকে গভীরে নিয়ে যায়।

একটু পরে আশুবাবু বললেন, 'তা তুই ত অন্য কোন হোটেলে কাজ করতে পারিস—এখানেই বা এত কষ্ট ক'রে পড়ে আছিস কেন ?'

এর জবাব না দিয়ে সেও আরো কত কি চিন্তা করতে থাকে। বুঝি তার বুকের অতলে যে স্মৃতির নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, তারি মধ্যে ডুব দিয়ে কোন্ হারানো মানিকের সন্ধান করে। সেও মানুষ, হোক না কেন গরীব, হোক সে অশিক্ষিত তবু তার সুখ-দুঃখ তার অনুভূতি কারুর চেয়ে কম নয়। তার সেই ঘোবা চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আশুবাবুর মনে হয় যেন তার অন্তরে কিসের সংগ্রাম চলেছে। সে জোর করে তাকে দাবিয়ে রাখতে পারছে না। অনুসন্ধিৎসার জাল তার মুখের ওপর বিছিয়ে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ তেমনি নীরবে বসে থাকেন আশুবাবু। তারপর একসময় ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেন, 'তোরও বুঝি কোন জান্‌পছ্‌না আদমী আছে এই হোটেলে ?'

'নেহি বাবু! হামলোকতো গরীব আদমী! গরীবের কি জান্ আছে—যে তার জান্‌পছ্‌না আদমী মিলবে! ইয়ে ত বড়া আদমী কা বাত্ হ্যায়!' বলতে বলতে কথাটাকে সহসা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, 'আমরা ত নুলিয়া, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আমাদের সঙ্গে লোকেদের সম্পর্ক। লোক আসে এখানে, স্নান করে, তারপর চলে যায়। এর বেশী আর কি আমরা পাই তাদের কাছে!'

আশুবাবু সহসা এক ঝলক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার মুখের ওপর। বললেন, 'তা হ'লে ওই ঢেউগুলোর মত-তারা কোন দাগ রেখে যায় না তীরে, এই বলতে চাস্ ত ?'

'হাঁ, বাবুজি। একেবারে ঠিক কথাটি আপনি বলেছেন!' ব'লে নিঃশব্দে আশুবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে নিভন্ত পিকাটাকে জ্বালিয়ে আবার ঘন ঘন টান দিতে থাকে। শাল-পাতার সঙ্গে কাঁচা তামাক-মিশ্রিত এক প্রকার অদ্ভুত গন্ধ তার মুখ

নিসৃত ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এ গন্ধটা আশুবাবু সহ্য করতে পারেন না। সহসা মুখটা ঘুরিয়ে নেন তার দিক থেকে।

সত্যিই কি, কিছুই দিয়ে যায় না কেউ এই সব হুলিয়াদের? আশুবাবুর মনে চিন্তার ঢেউ ভাঙ্গে।

হুলিয়াটা আর কোন কথা না ব'লে, পিকাটা টানতে টানতে উঠে পড়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে জমাট বাঁধতে থাকে। আশুবাবু তাঁর সেই হেলানো চেয়ারে ঠিক তেমনি ভাবেই ব'সে থাকেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখের ওপর ওই বিরাট বিস্তৃত কালো আকাশটা তারার চুমকিতে জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে।

রাত্রে হোটেলওয়ালী আসে টাকা চাইতে। আশুবাবুর সঙ্গে প্রথমে জমিয়ে ব'সে এমন সব ঘরোয়া আলাপ জুড়ে দেয় যেন তাঁর চেয়ে, আপনজন আর বুড়ীর কেউ নেই। স্বামী না কি ছিল রেলের ইঞ্জিন-ড্রাইভার। কি ক'রে হঠাৎ তার অকালমৃত্যু হলো, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে অবশেষে এই হোটেলটুকু কেমন ক'রে দাঁড় করিয়েছে ইত্যাদি বেশ আবেগঢালা কণ্ঠে—কখনো থেমে, কখনো বা তাঁর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে পরমাত্মীয়ের মত বলতে বলতে সহসা সিগারেটের শেষ অংশটুকু, যার আগুন ততক্ষণে দু'আঙ্গুলের প্রান্তে এসে প্রায় ঠেকেছিল, তা থেকে শেষ রসটুকু নিঃশেষে নিঙড়ে নেবার জন্যে আরো বারকতক টান দিয়ে তারপর আসল কথাটা পেড়ে বসতো। অর্থাৎ টাকার তার ভয়ানক প্রয়োজন, নইলে আশুবাবুর মত ভাল লোকের কাছে 'অ্যাড্‌ভান্স' চাইতে আসতো না!

এটা ছিল বুড়ীর টাকা আদায়ের একটা ফন্দী!

পাছে কেউ একটা পয়সা মেরে দেয়, এইজন্যে এইভাবে প্রত্যেক সপ্তাহের টাকাটা অগ্রিম হাতিয়ে নিয়ে রাখতো সকলের কাছ থেকে। যার যেদিন সপ্তাহ শেষ হয়, তার ঘরে ওইভাবে নৈশ ভোজের পর সিগারেট মুখে ধরিয়ে বুড়ী একবার ক'রে গিয়ে ঢুকতো এবং তার প্রতি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে মনোযোগ দিতে পারছে না, সেই কথাটা দুঃখের সঙ্গে সাড়ম্বরে জাহির করতে করতে একটা চেয়ারে চেপে বসতো। তারপর ঠিক ওই একই কৌশলে অগ্রিম টাকাটি বার ক'রে নিয়ে 'গুড্ নাইট' ব'লে বিদায় নিতো।

সেদিন আশুবাবুর কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়েও আবার ফিরে এলো বুড়ীটা। বললে, 'তোমার কাছে ওই হুলিয়াটা সব সময় কি এতো গল্প করে বলতো! ওকে তুমি মোটেই প্রশ্রয় দিয়ো না। লোকটা আদৌ ভাল নয়। হি ইজ্ এ ডিবচ্, এ র-ও-গ্।'

আশুবাবু প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'কেন, ও করলে কি! আমার কিন্তু মানুষটিকে ত ভালই মনে হয়।'

'ওঃ হরিব্‌ল্'—ব'লে মেমসাহেব মুখে এমন একটা আতঙ্কজনক ভঙ্গী করলে যে আশুবাবুর চোখে তা বিশ্রী লাগলো। তিনি মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। গরীব দুঃখীদের ঠকিয়ে খায়, আবার তাদেরই নিন্দে! তাই বুড়ীর ওপর প্রতিশোধ নেবার অন্য কোন উপায় না পেয়ে তিনি বললেন, 'লোকটা একটু শাই—মনে হয় খুব অনেস্ট, তাই পাঁচজনে ওকেই ঠকিয়ে খায়।'

'সাই না হাতী!' রাগে জ্বলে ওঠে বুড়ীর কণ্ঠ। বলে, 'হি ইজ্ এ বিস্‌ট্।'

'ডাঙ্গায় ওই রকম ভাল মানুষ ভিজে বেরালের মত দেখায়, কিন্তু জলে নামলেই ওর মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে, ওর চেহারা যায় বদলে। হি বিকাম্‌স্ এ হি-প্-পো—জলহস্তীর মত হিংস্র ও

রক্তপিপাসু হ'য়ে ওঠে। তুমি ওর সে মদোন্মত্ত চেহারা দেখো নি, তাই এই কথা বলছো!'

'কেন?' আশুবাবু তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে উঠলেন। 'রোজই ত আমাকেও স্নান করায়, এবং আমার মত আরো কত লোক ওর কাছে দেখি স্নান করে!'

'মাই গড্—আমি কি তোমার মত পুরুষদের কথা বলছি। পুরুষদের সঙ্গে আবার ও কি করবে? মেয়েমানুষকে নিয়ে স্নান করতে নামলেই ওর আসল চেহারাটা প্রকট হ'য়ে ওঠে! জলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দ্যাট্ সোয়াইন্ কত মেয়েদের যে ইজ্জত নষ্ট করেছে তার ঠিক নেই।'

'আর আজকালকার মেয়েগুলোও হয়েছে তেমনি! দে লাইক্ দ্যাট্ বাগার্ ভেরী মাচ্। ব'লে অনুশোচনা প্রকাশ ক'রে বলে, আমি সাবধান ক'রে দিয়েছি অনেককে কিন্তু তারা যদি আমার কথা না শোনে ত হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু বাবু?'

আশুবাবু এবার রীতিমত চটে উঠলেন। 'মিসেস্ ম্যাকেঞ্জি, আমি এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই। এই দুরন্ত সমুদ্র—যার ঢেউয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা, সেখানে যে কোন একটা মানুষের পক্ষে ওই রকম কিছু করা সম্ভব, আই ডোন্ট্ বিলিভ্!'

বুড়ী বললে, 'আমারও ত আগে ওই রকম ধারণাই ছিল। লোকটাকে ভালবাসতুম কিন্তু যেদিন চোখে দেখলুম, সেদিন থেকে আর ওকে আমি হোটেলের ধারে কাছে আসতে দিই না। তোমায় বলতে লজ্জা করে বাবু, মাদার্ এণ্ড ডটার্ বোথ্ ওয়ার্ হিজ্ ভিক্‌টিম্।'

'আপনি চোখে দেখেছেন?' উত্তেজিত হ'য়ে উঠে জিজ্ঞেস করেন আশুবাবু।

'ইয়েস্! ভেরী আগ্‌লি থিঙ্গ্। নইলে কি দরকার আমার যে মিছিমিছি একটা লোকের নামে বদনাম রটাবো!'

'তুমি শুনলে আশ্চর্য হ'য়ে যাবে যে সেই বৌটির হাস্‌ব্যাণ্ড ওকে হাতে হাতে ধরেছিল। তার বৌ ছিল ভয়ানক ভীতু। জলের ধারে-কাছে যেতে চাইতো না কোনদিন। কিন্তু যেদিন থেকে ওই নুলিয়াটার কাছে তাকে স্নান করতে ছেড়ে দিলেন, সেইদিন থেকে বৌটির স্নানের নেশা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। একবার সমুদ্রে নামলে আর উঠতে চায় না। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, পর্যন্ত কেটে যায়, হুঁস নেই। জলে প'ড়ে থাকে।'

'তার স্বামী একদিন খুব বেশী দেরী হচ্ছে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে খোঁজ নিতে এসে ওদের মতলবটা ধ'রে ফেললে। বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে আগে ঠেলে দেয় নুলিয়াটা বৌটাকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে আনে। বৌটা দু'হাতে তার গলাটা আঁকড়ে ধ'রে বুকের মধ্যে মিশিয়ে থাকে।'

এর পর একটু থেমে আশুবাবুর মুখের ওপর একটা কঠিন দৃষ্টি হেনে ফের বলতে শুরু করলে। 'সেই বৌটির একটা ইয়ং মেয়ে ছিল—ভেরী হ্যাণ্ডসাম্ লুকিং। কুমারী মেয়ে, তার সারা দেহ দিয়ে যেন যৌবন ফেটে বেরুচ্ছে! সেই মেয়েটা ওর সঙ্গে স্নান করতে নামতো সকালের দিকে। আর ওর মা যেতো দুপুরে।'

'ভদ্রলোক পরদিন আড়াল থেকে ওর মেয়েকে স্নান করানোটাও লক্ষ্য করলে, কিন্তু কাউকে কিছু বললে না। শুধু তার পরদিন ওই নুলিয়াটা যখন সেলাম ক'রে কিছু টাকা চাইতে এলো, তখন একটি হাণ্টার নিয়ে বেশ ক'রে আগাপাস্তলা ঠেঙ্গিয়ে দিলেন তাকে ভদ্রলোক। তারা ছিল আমার বাঁধা কাস্টমার—প্রতি বছর এক মাস ক'রে গরমের সময় এসে এই হোটেলে ফার্স্ট ক্লাশে থাকতো। ওই

হারামজাদার জন্যে তাদের আজ -তিন বছর হলো আমি হারিয়েছি। কম্‌সে কম্‌, এক মাসে আমার পাঁচশো টাকা প্রফিট হতো তাদের কাছ থেকে!'

আশুবাবুর মুখে কথা সরছিল না। বলে কি বুড়ী—একি সত্যি? মনের মধ্যে যখন এই রকম সব প্রশ্ন জট বাঁধছিল তখন বুড়ী মুখটা তাঁর কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমার কথা বিশ্বাস যদি না হয়—তা হ'লে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো বাবু—তবে ডোন্‌ট্‌ সে মাই নেম। আমার নাম করো না। বলো, লোকের মুখে এই রকম একটা কথা শোনা যায়—তোমাকে ও কি বলে শুনো! তা ছাড়া যদি এর ভেতর কোন সত্যি না থাকবে, তা হ'লে আমি-ই বা মিছিমিছি একটা লোকের সম্বন্ধে এত বিদ্বেষ পোষণ করবো কেন বাবু? ভগবানের কাছে গেলে যে আমিই অপরাধী হবো। বৃদ্ধ হয়েছি—দু'দিন পরেই হয়ত ডাক আসবে পরপারের, তখন কি কৈফিয়ৎ দেবো সেখানে গিয়ে!'

বুড়ী বিদায় নেবার পর অনেকক্ষণ ওই কথাটা আশুবাবু ভুলতে পারলেন না। তাঁর মনের মধ্যে যেন ঘুরপাক খেতে থাকে কথাগুলো। ওই অশিক্ষিত ঝুলিয়া, গোবেচারীর মত দেখতে, তারও তা হ'লে আছে ইতিহাস! কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। অথচ নিজে মুখে ওর কাছে সেটা ব্যক্ত করতেও কেমন যেন সঙ্কোচ হয়—শোভনতায় বাধে।

অবশ্য রাঘু নিজেই আশুবাবুর দু'কূল রক্ষা করলে।

পরদিন যথাসময়ে কাজকর্ম সেরে আশুবাবুর চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর গামছাটা বিছিয়ে সে বসে পড়লো। তারপর দেশলাইটা অভ্যাসমত তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে মুখের আধপোড়া পিকাটা জ্বালিয়ে কাঁচা তামাকের উগ্র গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে বললে, 'বাবু, কাল

অত রাত পর্যন্ত বুড়ীটা আপনার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলছিল আপনাকে ?'

আশুবাবু বললেন, 'তুই দেখলি কোথা থেকে ?'

রাঘু বললে, 'আমি তখন বাজার থেকে নুন কিনে নিয়ে বাসায় যাচ্ছিলাম ওই সমুদ্রের ধার দিয়ে।'

আশুবাবু এবার হালকা সুরে বললেন, 'তোর কথাই বলছিলেন ! তোকে না কি একজন বাঙ্গালী সাহেব একদিন হাণ্টার দিয়ে খুব মেরেছিল ?'

নিমেষে হুলিয়াটার মুখ-চোখের চেহারা গেল বদলে। যেন তার পুরনো ক্ষত স্থানটা কে ইচ্ছে ক'রে মাড়িয়ে দিলে।

আশুবাবুর মুখের দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে এবার প্রশ্ন করলে। 'শুধু ওই কথাটা বলেছে, না আরো কিছু বলেছে বাবু ওই বজ্জাত মাগী !'

আশুবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। 'মিছিমিছি কেন তুই গালাগাল করছিস তাকে ! তুই অন্যায় করবি, আর সে কথাটা লোককে বললেই বুঝি যত অপরাধ হলো ?'

'সব ঝুট ! মিথ্যে কথা বাবুসাব। আমি কোন অন্যায় করি নি ! ওই সাহেবের মেমটা আর মেয়েটা জল থেকে উঠতে চাইতো না সে কি আমার দোষ বাবু ? যত বলতুম, মেমসাহেব উঠে পড়ুন— দিদিমণি চলুন, আর নয়, আণ্ডার কারেণ্ট আজ খুব বেশী, তত যেন তাদের উল্লাস বাড়তো। যেমন মা তেমনি বেটি ! বলতো, ভয় কি, তুমি ত রয়েছো—তোমার হাত ধ'রে ত ডুবছি—আণ্ডার কারেণ্ট কি করবে ? সকাল বেলা দিদিমণি নাইতে নেমে ঠিক যে কথা বলতো, মেম সাহেবের মুখে দুপুরেও ঠিক তেমনি বুলি শুনতুম !'

এক একদিন মেম সাহেব রাগ ক'রে বলতো, 'আচ্ছা, তোমায়

এর জন্যে বক্‌শিস্ দিয়ে পুষিয়ে দেবো পরে। দিদিমণিও যখন তখন বক্‌শিস দিতো। মিথ্যে কথা বলবো না বাবু! আপনি ত আমার টাকা কেড়ে নিচ্ছেন না। কিন্তু গোলমাল বাধালো ওই বুড়িটা। ওই যত নষ্টের মূল। আমার ওই বক্‌শিসের টাকা থেকে ভাগ চাইলে, আমি দিতে নারাজ হলুম যখন, তখন ও চুপি চুপি সাহেবের কাছে গিয়ে আমার নামে লাগালে। বললে, আমার সঙ্গে মহব্বত আছে ওই মা আর বেটি—ছ'জনেরই!'

'সাহেব ভালমানুষ লোক। সব সময় বই পড়তো ঘরে শুয়ে শুয়ে। সেদিন যে সে চুপি চুপি বালির আড়ালে ব'সে আমাদের লক্ষ্য করছিল, তা জানতুম না।'

'সেদিন ছিল প্রবল আণ্ডার কারেন্ট। দিদিমণিকে নাওয়াতে নেমেছি সমুদ্রে। কসটিউমপরা সতেরো আঠারো বছরের ছুক্‌রী, ভারী ছুরন্ত। একটা কথা শোনে না বাবু। ঢেউয়ের মধ্যে ছুটে চলে যায়। রুখতে পারি না। রুখতে গেলে বলে, তুমি ত রয়েছো, ডুবে গেলে রক্ষা করবে, তোমায় তা হ'লে এত পয়সা দিয়ে রেখেছি কেন? কথাটা সত্যি বাবুজী, তাই বেশী নিষেধ করতে পারি নি!'

'একবার হাত ছাড়িয়ে যেই ঢেউয়ের মুখে গিয়ে পড়েছে আমি অমনি লাফ দিয়ে ওর ওপর পড়লুম ঝাঁপিয়ে। কিন্তু ও আমার গলাটাকে এমনভাবে তার ছ'খানা উরুতের মধ্যে আঁকশির মত আটকে দিলে যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আর কি! আমি যত বার নিজের গলাটা ওর উরুত ফাঁক করে টেনে নিতে চেষ্টা করি তত ও আরো জোরে চেপে ধরে। ওকে রক্ষা করা দূরে থাক ছ'জনেই বুঝি ডুবে মরি। যেন যমে মানুষে চলে টানাটানি। ওদিকে দিদিমণির অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। নোনা জল গিলেছে অনেক। তার ওপর প্রচণ্ড ঢেউ আছাড় মারছে তাকে। যেমন

রোলার তেমনি আণ্ডার কারেণ্ট। গড়াতে গড়াতে আমরা অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। দিদিমণির চুলের গোছা মুঠো ক'রে ধ'রে যেমন টানতে যাবো অমনি গেল হাত ফস্‌কে। খপ্‌ করে ওর গলার কাছে কস্‌টিউমটা যেই ধরলুম টেনে অমনি ঢেউয়ের ওপর ঢেউ এমন আছাড় দিয়ে পড়লো যে কস্‌টিউম্‌টা চড় চড় ক'রে ছিঁড়ে গেল। দিদিমণিকে ওই অবস্থায় তু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখন ডাঙ্গায় এনে তুলেছি, তখন দিদিমণি হুড় হুড় করে বমি ক'রে দিলে আমার গায়ের ওপর। একটু সুস্থ ক'রে ওকে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বকশিস চাইতেই চোখ রাঙিয়ে ছুটে এলো সাহেব। তার হাতে একটা ডাণ্ডা ছিল আমি দেখি নি। বেশ করে ঘা কতক আমায় দিয়ে বললে, উল্লু শুয়ার-কি-বাচ্চা তোকে পুলিশে দেবো। তুই আমার মেয়েকে বে-ইজ্জত করেছিস্‌। আমি সব দেখেছি দূর থেকে!'

'ওই বুড়িটাই সাহেবের মাথায় ওই সব ঢুকিয়েছিল, নইলে ওই ভাবে বিপদের হাত থেকে জান্‌ বাঁচিয়ে বকশিস চাইলে, কেউ ওরকম ব্যবহার করতে পারে বাবুজি! তা ছাড়া ওর মা, মেমসাহেবকেও কয়েকদিন এমনি বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলুম্‌। গভীর ঢেউয়ের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কোন রকমে আমার গলা তু'হাতে জড়িয়ে বেঁচে গেছে! এখানের সমুদ্রটা বড় খারাপ, বড় বেইমান বাবুজি—কখন যে কি রকম হবে কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া একদিন এখানে পোর্ট ছিল, মালপত্তর জাহাজে করে চালান যেতো—সেই জন্যে খুব গভীর। স্থানে স্থানে অনেক গাড্ডা আছে—সেখানে গিয়ে পড়লে ভারী বিপদ—কত লোকের জান যে চ'লে গেছে তার ঠিক নেই!'

বলতে বলতে সহসা থেমে গেল রাঘু। 'বাবু, শেলাইটা আর একবার দেবেন!' ব'লে হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে নিভে যাওয়া পিকাটা আবার ধরিয়ে নিলে।

আশুবাবু মন্ত্র-মুগ্ধের মত এতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যেন আধুনিক কোন লেখকের লেখা গল্প তাঁকে শোনাচ্ছিল ওই হুলিয়াটা। গল্পের রেশ তখনও মেলায় নি। আশুবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন—তোকে যখন সাহেব মারতে লাগল তখন তোর দিদিমণি কিছু বললে না? বললে না যে, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে—তোর জন্যে আজ তার জীবন রক্ষা পেয়েছে, নইলে অতল সমুদ্রগর্ভে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো?'

'না বাবুজি!' ব'লে নিঃশব্দে গোটা কতক টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'সেইটা-ই আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল সেই সময়। তা ছাড়া শুধু কি ওই মেয়ে—ওর মাকেও ওই রকম বিপদ থেকে কতবার বাঁচিয়েছি—তিনি ও সব জানতেন। কিন্তু একটা কথাও ওরা দু'জনে তখন কেউ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন না। সাহেব খেঁকী কুত্তার মত চীৎকার ক'রে আমায় বেত মারতে লাগল। শেষে আমি ছুটে তার ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচাই।'

আশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে নীরব হ'য়ে গেলেন।

রাঘুও যেন কি এক গভীর চিন্তায় গেল ডুবে। দু'জনেই চুপচাপ—শুধু তাদের সামনে অশ্রান্ত সমুদ্র তেমনি গর্জন ক'রে চললো।

কিছুক্ষণ পরে হুলিয়াটাই আবার মুখ খুললে। বললে, 'বাবুজি তবে হ্যাঁ, তখন চুপ ক'রে থাকলেও পরে বক্‌শিস্ দিয়েছিল মা ও বেটি দু'জনেই!'

এবার যেন আশুবাবু চেয়ারের ওপর দেহটাকে সোজা ক'রে নিয়ে বসলেন!

'পরে তা হ'লে বক্‌শিস্ দিয়েছিল তোকে—সাহেব কিছু বলে নি?'

'তা জানি না বাবু। মেমসাহেব ছোট ছেলেটাকে দিয়ে একদিন একটা খামের মধ্যে ভ'রে পঞ্চাশটা টাকা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আর দিদিমণি?' আশুবাবুর কৌতূহল যেন এখানে সবচেয়ে বেশী।

ঝুলিয়াটা বললে, 'অন্ধকারে একদিন ওই হোটেলের পাশ দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ ওদের ঘরের জানালার ভেতর থেকে একটা সোনার বালা কে যেন ছুঁড়ে মারলে আমার গায়ের ওপর। বালাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে হাতে নিয়েই বুঝতে পারলুম, এ জিনিষ কার। প্রতিদিন স্নান করানোর সময় দিদিমণির এই বালাটা আমার হাতে কত বার যে ঠেকেছে তার ঠিক নেই—কিন্তু কে এমন ক'রে ছুঁড়ে দিলে! ভাবতে ভাবতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময় দেখি জানালার পাশে পর্দার আড়ালে দুটো চোখ যেন জ্বলছে। দিদিমণি আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে! বুঝলুম! সেদিন দিদিমণি সাহেবের ভয়ে কিছু বলতে পারে নি, তাই এইভাবে আমার বক্‌শিস্‌টা শোধ করে দিলে!'

'পরের দিন সকালে দেখি ওদের ঘরটা খালি। বুঝলুম তারা আগের দিন রাত্রের মেল্‌-এ চলে গেছে কলকাতায়!'

আশুবাবু বললেন, 'এখন আর তাদের কথা তোর মনে পড়ে না?'

'মনে পড়ে না আবার? যতদিন বেঁচে থাকবো কখনো ভুলবো না বাবুজি! এমন অপমানও যেমন আমায় কেউ করে নি, তেমনি এত বক্‌শিস্‌ও এ জীবনে আর কারুর কাছে পাই নি!' ব'লে সহসা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল!

আশুবাবুও নীরব দৃষ্টি সমুদ্রের ওপর মেলে তেমনি ভাবে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

তাঁর মনের মধ্যে তখন কিসের বেদনা যেন গুমরে মরতে থাকে! কেন, তা নিজেই বুঝতে পারেন না। একি পরিবর্তন হচ্ছে তাঁর মনের? কেবলি যেন মনে হতে থাকে, তবু এ শতগুণে ভাল। অল্‌ দিস্‌ এণ্ড হেভেন্‌টু হোক্‌ খারাপ, তবুও এতে স্বর্গসুখ।

কি মধুর ব্যথা এরা সবাই বুকে বহন করছে! আর এদের তুলনায় তার জীবনটা কি! তিনি কি পেয়েছেন এ জীবনে? চরিত্রবান, নীতিবাগিশ, সদ্‌লোক—সারা জীবন ধ'রে পরোপকার করেছেন, তাই ওই খ্যাতির বোঝাগুলো লোকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। চিনির বলদের মত তিনি শুধু সেই বোঝা ব'য়ে চলেছেন। কতটুকু খ্যাতির মূল্য তাঁর নিজের কাছে?

উপবাস করে মেয়েরা। নির্জলা উপবাস। কণ্ঠ শুকিয়ে, বুক মরুভূমি হ'য়ে গেলেও এক ফোঁটা জল মুখে দেয় না, পাছে পূণ্য থেকে বঞ্চিত হয়। পরকালে তাদের জন্যে যে পূণ্য সঞ্চিত হচ্ছে, একদিন তারা তা নিশ্চিত পাবে, এই তাদের বিশ্বাস। কিন্তু তিনি কি পাবেন? কে তাঁর জন্যে কোথায় কি সঞ্চয় ক'রে রেখেছে!'

এতদিন পরে হঠাৎ এই প্রশ্নটা মাথা তুলে দাঁড়াল অশুবাবুর মনে। ওই অশিক্ষিত নুলিয়াটা যেন তাঁকে দিব্যজ্ঞান দিয়ে গেল।

আশুবাবুর তাই কেবলি মনে হতে থাকে। যেন এমন একটা জীবনের বোঝা তিনি বইছেন—যা ব্যর্থ, অন্তঃসারশূন্য! লোকের মুখে শোনেন, তিনি ভাল লোক। ঐটুকুই মাত্র, কিন্তু সে-ভালো কার কাছে? কার অন্ধকার মনের গভীরে সে-ভালো প্রদীপের শিখার মত জ্বলছে!

তার চেয়ে অনেক বেশী সুখী ওই নুলিয়াটা! আর হোটেলের ঘরে ঘরে ওই যেসব মানুষ, দিনের পর দিন এসে স্তব্ধ দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে বাক্যহারা হ'য়ে!

নুলিয়াটা প্রতিদিনের মত আরো কিছুক্ষণ সেখানে গামছা পেতে শুয়ে গড়িয়ে তারপর উঠে চলে যায়।

আশুবাবু কিন্তু নিশ্চল পাথরের মত তেমনি বসে থাকেন! যেন

কি পায় নি তিনি এ জীবনে বসে বসে তারি একটা খতিয়ান কষতে থাকেন।

জীবনের জমা খরচের পাতাটা ওল্‌টাতে গিয়ে প্রথমেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন কলেজ জীবনে এসে। তাঁর মানসপটে তখন ভেসে ওঠে কৈশোর ও যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলির স্মৃতি!

তিনি যে কলেজে পড়তেন, সবে তখন সেখানে সহ-শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে।

আই, এ-র দু'টো সেকশন মিলিয়ে এগারোটি মেয়ে আর বি, এ-তে পাঁচটি—মোট এই ষোলটি ছাত্রী, আর ছাত্রের সংখ্যা সাড়ে ছ'শোর কম তো নয়ই বরং কিছু বেশির দিকে।

এককালে এ কলেজের খুব নাম-ডাক ছিল। যদিও সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই, সবাই তা জানে তবু দূরদূরান্ত থেকে যে ট্রামে-বাসে বহু পয়সা খরচা ক'রে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসতো সে শুধু পুরনো গৌরব স্মরণ ক'রে।

আশুবাবুদের সেকশনে আই, এ-তে যে ছ'টি মেয়ে পড়তো তাদের একটি ফেল্ ক'রে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। বাকী পাঁচজন যখন একই কমবিনেশন্ নিয়ে বি, এ-তে তাদেরই সেকশনে পড়তে এলো, তখন উভয় পক্ষই যত না বিস্মিত হ'ল তার দশ গুণ হ'ল খুশি। গত দু'টো বছর যারা ছিল অপরিচিতার মতো, শান্ত শিষ্ট নিরীহ ছাত্রী, প্রফেসারদের পাশের বেঞ্চিতে ব'সে ঘাড় নীচু ক'রে স্ত্রী পুরুষের ব্যবধান রক্ষা ক'রে চলতো নিজেদের দু'খানা বেঞ্চিরগণ্ডীর মধ্যে, এবার তাদের ব্যবহারে দেখা দিল আশ্চর্য পরিবর্তন! বিশেষ ইক্‌নমিকস্ অনার্স নিয়েছিল যে তিন জন মেয়ে, তাদের সঙ্গে কোথা দিয়ে যেন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো পুরনো সাত-আটটি ছেলের।

অনার্স ক্লাসে এসে তারা কেবলমাত্র সমানভাবে আড্ডাই দেয় না

এদের হাসিঠাট্টায় সমান অংশও গ্রহণ করে। বেলা রায় যেমন ছিল মেয়েদের মধ্যে বয়সে বড়; তেমনি রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি সবই বুঝি কিছু বেশী পরিমাণে দিয়েছিলেন বিধাতা তাকে। এরা তাকে ডাকতো 'বেলাদি' বলে! প্রথমটা বেলা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার কি মনে ক'রে নিজেই মেনে নিয়েছিল সে সম্মান।

আশুবাবুদের দলের পাণ্ডা ছিল বিশ্বজিৎ। অন্য ছাত্রদের মত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার গলা কাঁপতো না বা ঘেমে উঠতো না! শোনা যায়, এই বয়সে অনেক মেয়ের সঙ্গে অনেক কিছু সে করেছে। সে একেবারে বেলার সামনে এগিয়ে এসে বললে, 'আজ থেকে যখন আমাদের দিদি হলেন, তখন খাইয়ে দিন কিছু ছোট ভাইদের। আজ দিনটা ভাল, এটাকে সেলিব্রেট্ করা যাক, যাতে চিরস্থায়ী হয়।'

বেলাও পিছিয়ে যাবার মেয়ে নয়। সঙ্গে সঙ্গে কালো ভেলভেটের ওপর রেশমী ফুলের কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে বললে, 'কি খাবেন বলুন?'

'টিফিন রুম থেকে গরম কাটলেট আনা যাক।'—ব'লেই বিশ্বজিৎ সঙ্গে সঙ্গে মাথা গুণতে আরম্ভ করলে, 'এক, দুই—আমরা আট জন আর আপনারা তিন জন। মোট এগারোখানা, আট আনা হিসেবে—।'

বেলা বললে, 'অর্থাৎ দশ, কারণ আমি বাদ—

'না, তা হবে না, তা হ'লে আমরাও নেই এর মধ্যে!'—রমা ও দীপ্তির সঙ্গে বিশ্বজিৎরা সকলেই বেঁকে বসলো।

বেলা একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ডাক্তারের দোহাই পাড়ে নিজেকে বাঁচার জন্য। 'ডাক্তারের নিষেধ আছে যে!'

অতীশ বললে, 'বেশ, তা হ'লে অন্য কিছুর ব্যবস্থা করা হোক।'

'না না, যখন আপনাদের কাটলেট্ খাবার বাসনা হয়েছে, তখন আমিও খাওয়াবই। তা ছাড়া আমি যখন হোস্ট্রেস, হাতে ক'রে আপনাদের খাওয়াবো, তখন আর আপত্তি করা উচিত নয়।'

এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে আশুবাবুদের দলের কয়েকজনের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন যেন বেড়েই চলে। পুরনো সহপাঠিত্বের দাবীতে কি না জানি না, সকলের মধ্যে থেকেও যেন ওরা একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

বেলাদি তার ভ্যানিটি ব্যাগটি ভর্তি ক'রে আনে চকোলেট, টফি প্রভৃতি, অনার্স-ক্লাশে সেগুলো বিতরণ ক'রে দিতে তাদের সকলকে। প্রফেসর সোম যখন ইক্‌নমিকস্-এর দুরূহ অংশ বোঝাতে থাকেন, তখন পিছন থেকে কেউ তার আঁচল ধরে টানে, কেউ পেন্সিলের শিস্ ফুটিয়ে দেয় পিঠে। বেলা জানতো এর অর্থ কি। তাই গম্ভীর মুখে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপি চুপি বেঞ্চির তলা দিয়ে বাঁ হাতটা পিছনে বাড়িয়ে দিতো। অতি সন্তর্পণে প্রফেসরের চোখ বাঁচিয়ে টুপটাপ ক'রে বিশ্বজিৎ প্রভৃতি সেগুলো তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিতো।

আশুবাবুর কিন্তু এটা ভাল লাগত না। বিশ্বজিৎকে সতর্ক ক'রে দিতেন। বলতেন, 'ছিঃ, কি মনে করছে বেলাদি!'

তাঁর মুখের ওপর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত বিশ্বজিৎ, 'কি মনে করছে সে আমি বুঝবো! তোর তাতে কি!'

ভাল বিলিতী ছবি এলে কোনদিন বা তারা দল বেঁধে সাহেব-পাড়ায় যেতো সিনেমা দেখতে। এ ছাড়া আর্ট একজিবিশন, ইন্টারন্যাশনাল খেলাধুলো এলে উৎসাহ সকলের বাড়তো! কিন্তু সব সময় তাদের টিকিনের ভারটা যেচে নিতো বেলা নিজের ঘাড়ে।

এটা খাব, ওটা খাব ব'লে ছোট ভাইয়ের মত যখন সবাই আব্দার ধরতো, বেলার তখন ভারী ভাল লাগতো। হাসিতে খুশিতে গদগদ হয়ে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত সকলকে খাওয়াতো, কিন্তু নিজে কিছু খেতো না—এই ছিল তার বড় দোষ। সব সময়ই ডাক্তারের দোহাই পাড়তো। বলতো, 'হোটেলে খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ!'

ওই সব দুরন্ত সহপাঠীদের একদিন চোখে না দেখলে যেন তার বুকের ভেতরটা হু হু করতো। রবিবার ও ছুটির দিনগুলো যেন কাটতে চাইতো না বেলার। অথচ আই, এ পড়ার সময় দু'টো বছর কি কষ্টেই না কেটেছিল! কতদিন তার মনে হয়েছিল যে যেচে আলাপ করবে সহপাঠীদের সঙ্গে, কিন্তু তার সঙ্গিনীদের জন্যে পারে নি। তারা নিষেধ করেছিল, 'ছিঃ আমাদের কি মানসম্ভ্রম নেই যে আমরা আগে থেকে গায়ে প'ড়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে যাবো!' আশুবাবুর কাছে পরে নিজে গল্প করেছে বেলা এই সব।

আগ্রহ যে ও-তরফের একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে সেটা একটু বিকৃত ধরনের। তাকে নারীত্বের অবমাননা মনে ক'রে তারা ঘৃণা করতো! শিস্ দেওয়া, চোরা-চাউনী, তাদের উদ্দেশ্যে অলক্ষ্য থেকে নানারূপ মন্তব্য বর্ষণ, দু-এক ছত্র উড়ো চিঠি, কবিতা, কখনো বা খড়িতে লেখা কোন ছেলের নামের সঙ্গে যুক্তচিহ্ন দেওয়া কোনো মেয়ের নাম। এ সব দীর্ঘদিন ধ'রে তারা সহ্য করেছিল মুখ বুঁজে, অথচ এ থেকে মুক্তি পাবার যে কি উপায় কোনদিনই তা আবিষ্কার করতে পারে নি।

আশুবাবু ছিলেন ক্লাশের সেরা ছেলে। যেমন চরিত্রবান, তেমনি বিনয়ী! তাকে মেয়েরা, বিশেষ ক'রে বেলা মনে মনে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু দু'টো বছর শেষ ক'রে যেদিন টেস্ট্ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো, সেদিন তারা এগারোটি মেয়ে একত্রিত হোয়ে এগিয়ে এসে

দাঁড়ালো ফটকের কাছে! ছেলেদের দল তাদের পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে আসছিল, হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়িয়ে যেতেই বেলা এগিয়ে এসে প্রথমে আশুবাবুকে বললে, 'দেখুন, দু'বছর ধরে আমরা একসঙ্গে এক কলেজে পড়লুম। অথচ এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে কেউ কারুর নাম পর্যন্ত জানলাম না। সহশিক্ষার কি এই নীতি? আসুন, আজ আমরা সকলের সঙ্গে পরিচয় ক'রে বন্ধুভাবে বিদায় নিই।'

সেই প্রথম আলাপের সূত্রপাত! এখন মনে পড়লে হাসি পায় আশুবাবুর। কলেজে লেখাপড়ার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল সত্যি, কিন্তু কেন কে জানে, সেদিন সবচেয়ে আকর্ষণ করেছিল বেলা আশুবাবুকে। ওদিকে সহপাঠীদের অভাব ছুটির দিনে বেলাও মর্মে মর্মে অনুভব করতো, কেবলি তার মনে হতো, আগের দিনে এই সময় কলেজে বিশ্বজিৎ কোন্ কথাটা ব'লে তাকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করেছিল কিংবা অতীশ কি ভাবে তার কাছে একখানা বই চেয়েছিল কিংবা ককলের চেয়ে মাথায় ছোট সেই বিমলেন্দু, ছোট্ট একটা রসিকতা ক'রে কি ভাবে তাদের সকলকে হাসিয়েছিলো। ঐশ্বর্য, দাসদাসী, বাড়ী-গাড়ী, বাপ-মায়ের আদর সব যেন তার কাছে ম্লান হ'য়ে যায়। সহপাঠী নয়, তারা যেন তার ভাই, বন্ধু, পরমাত্মীয়।

একদিনের কথা আশুবাবুর এখনো স্পষ্ট মনে আছে। টিপ্ টিপ্ ক'রে সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। ছুটির পর বাস ধরার জন্যে হন হন ক'রে বেলারা তিন বন্ধু এগিয়ে যাচ্ছিল বড় রাস্তার দিকে। এমন সময় জনকয়েক ছোক্‌রা একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে হঠাৎ শিস্ দিয়ে মুখে কি একটা অশ্লীল উক্তি করলে। তারা জানতো না যে, তাদের পিছনে আশুবাবু ও বিশ্বজিতরা আসছিল। আর যায় কোথায়? অতীশ, বিমলেন্দু ও বিশ্বজিৎ বাঘের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর উভয় পক্ষে কি মারামারি!

বিশ্বজিতের কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। অতীশের চশমাটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেলো। আর বিমলেন্দুর পকেট থেকে তার সোনার কলমটা কোথায় হ'ল উধাও। বেলা ছুটে এসে আশুবাবুকে বললে, 'আপনি ভাল মানুষ, পালিয়ে যান শিগ্‌গির, ওদের সঙ্গে যাবেন না।'

সত্যি যেচে একদিন যদি এদের সঙ্গে আলাপ না করতো হয়তো বেলারা কোনদিন বুঝতেও পারতো না যে সহপাঠীরা তাদের কি চোখে দেখে! সহপাঠীদের সম্বন্ধে হয়তো বা একটা বিরূপ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকতো।

উল্টোডিঙ্গী থেকে দু'খানা বাস বদল ক'রে বেলা পড়তে আসতো মধ্য কলকাতার এই কলেজে। পথে মেয়েদের কলেজও ছিল, কিন্তু বেলা তাতে পড়ার কোন উৎসাহ পেতো না। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েদের সাহচর্য বেলার আদৌ ভাল লাগতো না। আলোচনা করার মত বিষয়বস্তু তারা যেন খুঁজে পায় না। দেখা হ'লেই হয় পরচর্চা, নয়তো কোন্ মেয়ে কোন্ পুরুষের প্রেমে পড়েছে, কে কাকে ক'খানা প্রেমপত্র লিখেছে নতুবা সিনেমার কথা—তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ছবি বা যৌন-আবেদনপূর্ণ হিন্দী ছবির গল্প সকল সময় তাদের মুখে। নিভৃতে আশুবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে কতদিন বেলা একথা তাঁকে বলেছে।

অথচ তাদের সঙ্গে এই সব সহপাঠীদের তুলনা হয় না। খেলাধুলা, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি—চীন, ফরমোশা, রাশিয়া, অন্ধ্র, ফাইভ ইয়ারস্ প্ল্যান, চার্চিল, বুলগেনিন, প্রভৃতি সব সময় লেগেই আছে এদের মুখে। এদের সেই সব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা যেন মুহূর্তে বেলার মনকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টেনে নিয়ে যেতো। প্রতিদিন একটা না একটা নতুন ভাব মনে নিয়ে সে যখন বাড়ী ফিরে যেতো

তখন ধন-দৌলত অট্টালিকা সব যেন তুচ্ছ মনে হতো তার কাছে। সহপাঠীদের মুখগুলো চোখের সামনে ভাসতো। আশুবাবুকে মনে মনে পূজো করতো সে জ্যেষ্ঠ ভায়ের মত। চরিত্রবান, আদর্শবাদী, ভাল ছেলে, লেখাপড়ার ব্যাপারে সব সময় তাঁর উপদেশ মত চলতো।

সবচেয়ে দুরন্ত ছিল বিশ্বজিৎ। দুষ্টুমিতে যেমন সকলের অগ্রণী, লেখাপড়াতেও তেমনি মন্দ ছিল না। আশুবাবু কিন্তু ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে নিষেধ করতেন বেলাকে। কারণটাও আভাষে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন কিন্তু বেলার মনে তাতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না ব'লে মনে মনে দুঃখিত হতেন তিনি।

একদিন বিশ্বজিৎ বেলার হাত থেকে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে পালালো। মুস্কিলে পড়ে বেলা। তার পয়সা-কড়ি যাবতীয় সব কিছু তার মধ্যে। অবশেষে ব্যাগটা হারিয়ে গিয়েছে ব'লে, এক মাইল হেঁটে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে পয়সা ধার ক'রে তবে সে বাড়ী ফেরে! কিন্তু পরদিন ক্লাশে যখন বিশ্বজিৎ ব্যাগটা ফিরিয়ে দিলে তখন বেলা দেখে সেটা দামী চকোলেট ও টফিতে ভর্তি।

'এ কি করেছেন? বেলার কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হ'লেও খুশিতে চোখ দুটো যেন ভ'রে ওঠে!'

'বেশ করেছি। একদিনও আমাদের দেওয়া জিনিস কিছু খাবেন না অথচ রোজ আমাদের খাওয়াবেন! কেমন জব্দ, দেখি এবার না খেয়ে কোথায় যান!'

বিশ্বজিতের কণ্ঠের দরদ দেখে বেলার চোখ দুটো যে নিমেষে বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিলো তা কেউ লক্ষ্য করে নি। শুধু আশুবাবুর চোখে তা পেড়েছিলো। সব ভুলে গিয়ে বেলা তার মুখের দিকে তাই নীরবে তাকিয়ে ছিলো। তারপর এক ঝলক হাসি ছিটিয়ে তার সমস্ত মুখখানি সিক্ত ক'রে দিয়েছিলো।

বলাবাহুল্য, আশুবাবু এতে আদৌ খুশি হন নি। বরং মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। বেলাও তা বুঝতে পেরেছিলো। সে জানতো যে আশুবাবু তাকে মনে মনে ভালবাসেন। দেখতে দেখতে আরো বেশী অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলেন আশুবাবু বেলার সঙ্গে।

এদিকে তাদের এই মেলামেশার সুযোগ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কানাকানিও কম চলে না। তাদের সম্বন্ধে নানা কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে ঘোরে মুখ থেকে মুখে।

আশুবাবু কান দেন না সে সব গুজবে। প্রাণখোলা হাসি হেসে যেন উড়িয়ে দেন সব। তবু আশুবাবু গোপনে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

এর জন্যে তাঁর প্রতি বেলার শ্রদ্ধা আরো বাড়ে। কিন্তু একদিন দীপ্তি তাকে সেদিকে ইঙ্গিত করলে রাগে সে জ্বলে উঠলো। বললে, 'তুই এদের সঙ্গে এত মিশেও যদি এদের চিনতে না পেরে থাকিস্ ত ধিক তোকে! তুই কি এদের কাছ থেকে কখনো কোন উপকার পাস নি!'

দীপ্তি লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে নিলে। সত্যি কিছুদিন আগে যখন তার টাইফয়েড হয়েছিলো, বেলার সঙ্গে অতীশ বিশ্বজিৎ প্রভৃতি তাকে দেখতে গিয়ে তাদের দারিদ্র দেখে স্বেচ্ছায় নিজেদের ভেতরে চাঁদা তুলে তাকে চিকিৎসা করিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলো। দীপ্তির বাবা উদ্বাস্তু, তাঁর এমন সামর্থ্য ছিল না যে একটা বড় ডাক্তার ডাকেন, তাই সেদিন চোখের জল ফেলে বিশ্বজিৎদের শত ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তিনি।

এ ছাড়া বই দিয়ে, ক্লাশের নোট্ দিয়ে লেখাপড়ার ব্যাপারে কত সাহায্য যে যখন-তখন তারা করে, তার সীমা নেই।

পরীক্ষার আগে রমা ও দীপ্তি একত্রে পড়তে যেতো কোনদিন অতীশের বাসায়, কোনদিন বিমলেন্দু বা বিশ্বজিতের কাছে। এই সূত্রে উভয় পক্ষে একটা মধুর পারিবারিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিলো।

অথচ সহপাঠীদের সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা থাকা সত্বেও কিন্তু বেলা কোনদিন তার বাড়ীতে আশুবাবু ছাড়া আর কাউকে যেতে বলতো না। এ নিয়ে সহপাঠীরাও মনে মনে ঈর্ষা করতো আশুবাবুকে। নিশ্চয় কোন বাধা আছে, হয়তো তার অভিভাবকরা পছন্দ করেন না—এই মনে ক'রে সবাই নীরব থাকতো।

কিন্তু একদিন বিশ্বজিৎ বেলার মুখের ওপর ব'লে বসলো, 'আশু ভাল ছেলে, দেবতা! আমরা সব খারাপ ছেলে, আমাদের মুখে লাম্পট্যের ছাপ আছে যে!' এ কথা শুনে বেলার চোখে জল এসে পড়ে।

দু'টো বছর যেন কোথা দিয়ে শেষ হ'য়ে যায়। সেদিন টেস্টের রেজাল্ট বেরুলে বিমলেন্দু প্রস্তাব করলে একটা পিক্‌নিক্ করার। সে বললে, 'বি, এ, পরীক্ষার পর কে কোথায় ছিটকে যাবো তার ঠিক্ নেই, তাই একদিন সকলে মিলেমিশে শেষ আলাপ ক'রে নেওয়া যাক।'

বলা বাহুল্য, উৎসাহের অভাব উভয় পক্ষের কারুরই দেখা গেলো না। বেলা আগেই ব'লে উঠলো, 'এটা কিন্তু বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে করতে হবে।'

তাই ঠিক হ'ল। তবে বিশ্বজিৎ বললে, 'এবার কিন্তু সকলের কাছ থেকে চাঁদা নিতে হবে, একা বেলাদিকে খাওয়াতে দেবো না।'

সকলকে এই প্রস্তাব সমর্থন করতে দেখে অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে বেলা তা মেনে নিলে।

নির্দিষ্ট দিনে ট্যাক্সি বোঝাই ক'রে মাছ, মাংস, ডিম, পাঁউরুটি, বাটার, জ্যাম-জেলি প্রভৃতি নিয়ে তারা সাড়ে ন'টা নাগাদ গিয়ে হাজির হ'ল বোটানিক্‌স-এ।

প্রথমেই সুরু হ'ল জলযোগ পর্ব। বেলা বাটার ও জেলির কৌটো কেটে, পাঁউরুটিতে মাখিয়ে সকলকে দিতে না দিতেই রমা ও দীপ্তি চা তৈরী ক'রে ফেললে।

রমা ও দীপ্তিকে বেলা যখন সব দিয়ে দিলে, তখন সকলে একবাক্যে ব'লে উঠলো, 'আপনার রাখলেন না বেলাদি?'

'না আমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি ভাই।'

'তা শুনবো না, আপনাকে কিছু খেতেই হবে।' সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো।

'আচ্ছা, খাচ্ছি। জান তো, ওসব খেতে আমায় ডাক্তারে নিষেধ করেছেন!'—ব'লে ভালো ক'রে হাত ধুয়ে নিজের ছোট্ট সুটকেসটা খুলে এক বাক্স উৎকৃষ্ট সন্দেশ বার ক'রে সকলকে এক একখানা দিয়ে, বেলা নিজে একটু গালে ফেললে।

'হ'ল তো এবার!'—ব'লে একগাল হেসে বেলা বললে, 'এখন রান্নার যোগাড় করতে হবে—!'

বেলা আড়াইটার সময় মাংসের হাঁড়ি নামতে সকলে শালপাতা বিছিয়ে গোল হ'য়ে ব'সে গেলো। বেলাকে ইতস্তত করতে দেখে বিশ্বজিৎ বললে, 'বেলাদি, মাঝখানে মাংস আর পোলাওয়ের হাঁড়ি থাক্, আমরা যে যার প্রয়োজনমত তুলে নেবো হাতা কাটিয়ে, আপনি তাড়াতাড়ি ব'সে পড়ুন ঐ পাতাটাতে।'

'না ভাই, সে ভাল হ'বে না। তার চেয়ে তোমরা সকলে খাও, আমি তোমাদের পরিবেশন করি।'

দীপ্তি ও রমা সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। আমরা তিনজনে আপনাদের পরিবেশন ক'রে আগে খাওয়াই, তারপর আমাদের আপনারা খাওয়াবেন।'

আশুবাবু বললেন, 'সেই ভালো।'

অগত্যা তাই ঠিক হ'ল।

কিন্তু বিপদ দেখা গেলো যখন ওদের খাওয়ার পর তিনখাতা পাতা পড়লো। দীপ্তি ও রমা আগেই ব'সে পড়েছিলো, বেলাকে ডাকতে তার মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের যেন গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

বিশ্বজিৎ বললে, 'কি হ'ল ? বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি তাই মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে !'

'না ভাই। আমার পেটটা বড় ব্যথা করছে হঠাৎ। আমি ওসব কিছু খাবো না। আমি একটু বিশ্রাম করি, তোমরা ওদের ছু'জনকে খাইয়ে নাও ততক্ষণ।'

'তা হবে না। এবার কোন কথা শুনবো না। আসুন শিগগির।' ব'লে শাসনের ভঙ্গীতে এগিয়ে গেলো বিশ্বজিৎ।

মাথাটা ছু'হাত দিয়ে টিপে ধ'রে সহসা মাটির ওপর ব'সে পড়লো বেলাদি। তারপর বিবর্ণ মুখে বললে, 'আমায় মাপ করো ভাই, শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে। আজ তোমাদের রান্না ক'রে খাওয়ালুম, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হ'তে পারে আমার !'

বিমলেন্দু বললে, 'সত্যি যদি শরীর খারাপ হ'য়ে থাকে তো পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। বেলাদির তো অভ্যেস নেই। এতক্ষণ ধ'রে আগুনতাতে রেঁধে হয়তো শরীর খারাপ হ'য়ে পড়েছে।'

'বেশ। তা হ'লে একটুখানি অন্তত মুখে দিতেই হবে আপনাকে।' —ব'লে বিশ্বজিৎ একটা প্লেটে ক'রে কিছু মাংস আর এক মুঠো পোলাও এনে তার মুখের কাছে ধরলে।

ওয়াক্—এখনি বুঝি বমি হ'য়ে যাবে ! সঙ্গে সঙ্গে নাকে কাঁপড় চেপে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলে বেলাদি।

বড় জবরদস্ত বিশ্বজিৎ, সবাই তা জানে। সে তাই ব'লে উঠলো,

'দেখো বেলাদি, তুমি যদি এ রকম করো তা হ'লে কিন্তু তোমাকে জোর ক'রে খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো, মনে রেখো।' ব'লে যেই এক টুক্‌রো মাংস বেলার মুখের কাছে তুলে ধরলো অমনি সে সোজা উঠে দাঁড়ালো। যেন ছাইচাপা আগুন নিমেষে জ্বলে উঠলো। তারপর কম্পিত শিখার মত এক অদ্ভুত মিনতি তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হ'ল—'ছিঃ ভাই, আমি যে বিধবা, আমার কি এসব খেতে আছে?'

বিধবা! যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল! নিশ্চল নির্বাক, পাথরের মূর্তির মত তারা যে যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে রইলো। আর সেখানিকার গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস, পাখী-পক্ষী সব যেন সঙ্গে সঙ্গে কি এক স্তব্ধ নৈঃশব্দের অতলে বিলীন হ'য়ে গেলো।

শুধু বেলাদির চোখ দিয়ে নিঃশব্দে ধারা বইছিলো। কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে যাবার পর চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বেলাদি বললে, 'এর জন্যে সব অপরাধ আমার ভাই। মুখ ফুটে কোনদিন তোমাদের কাছে এ কথাটা বলতে পারি নি, পাছে তোমাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে, তোমাদের ইচ্ছামত খাওয়া থেকে বঞ্চিত করি। আমায় ক্ষমা করো আজ তোমরা।'

সেদিনের কথা আশুবাবু আজও ভোলেন নি! বেলা তাঁর চোখে দেবীপ্রতিমায় রূপান্তরিত হয়েছিলো সেদিন।

এর পরও অনেকক্ষণ সকলের মুখ বোবা হ'য়ে রইলো। অবশেষে বিশ্বজিৎ সে কথার উত্তর দিলে, 'কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে থেকে উপবাসী হ'য়ে তোমায় কিছুতেই যেতে দেবো না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে ব'সে খেতেই হবে।'

ভয়ার্ত কণ্ঠে বেলাদি বললে, 'এখানের সবই ছোঁয়াছুঁয়ি হ'য়ে গেছে, কি খাবো? আমি যে ব্রাহ্মণের বিধবা ভাই!'

'আমিও ব্রাহ্মণের ছেলে, ভুলে যেয়ো না বেলাদি। তোমার

সামনে গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে যদি গামছা প'রে তোমায় হবিষ্যি রেঁধে দিই, তা হ'লে তুমি খাবে, কথা দাও বেলাদি ? বলো চুপ ক'রে থেকো না !'

'কিন্তু কি দরকার এত হাঙ্গামার ভাই ! এক বেলা না খেলে আমার কোন কষ্টই হবে না—একাদশী করা আমার অভ্যাস আছে।'

'তোমার দরকার নেই কিন্তু আমাদের দরকার যে !' ব'লেই তখনি অতীশ ও বিমলেন্দু ছুটে গিয়ে নতুন হাঁড়ী, আতপ চাল প্রভৃতি কিনে আনলে। আর গঙ্গাস্নান ক'রে এসে ভিজে গামছা প'রে হবিষ্যি বেঁধে দিল বিশ্বজিৎ।

খেতে খেতে বার বার বেলার ত্বু'চোখ ঝাপসা হ'য়ে এলো। এত আন্তরিকতা বুঝি তার এই চব্বিশ বছর জীবনের মধ্যে আর কখনো সে পায় নি। অথচ এই সহপাঠীরা তার কে ?

বিশ্বজিৎরা ট্যাক্সি ক'রে বেলাকে যখন তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে বললে সে তখন আপত্তি ক'রে বললে, 'না, আমি একাই যেতে পারবো।'

কিন্তু কেন জানি না, সেদিন কেউ আর তার কথা শুনলে না। তাতে রাজী হ'ল না। বেলাদিকে যেন আজ বড় অসহায় ব'লে মনে হ'ল সকলের।

বাড়ীর দারজার কাছে নামিয়ে দিয়ে যখন বিশ্বজিৎ বললে, 'আচ্ছা আমরা তা হ'লে এখন আসি বেলাদি, তখন কোন জবাব না দিয়ে শুধু ত্বুই চোখে উদ্গত অশ্রু নিয়ে ছুটে যেন পালিয়ে গেলো বেলাদি ভিতরে। তারা কেউ জানতে পারলে না যে ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের সেই অপস্রিয়মান ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে কাঁদছিলো।

শুধু পিছন ফিরে জানালা দিয়ে তাকাতে গিয়ে আশুবাবু দেখতে পেয়েছিলেন বেলাকে।

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল! আশুবাবু শুনলেন যে বিশ্বজিতের সঙ্গে বেলা পালিয়েছে।

আশুবাবু একমাস রাত্রে ঘুমতে পারেন নি এর পর। বেলাকে তিনি মনে মনে ভালবাসতেন এবং বেলাও তাঁকে ভালবাসতো। সে ভালবাসা বিশুদ্ধ—যাকে বলে 'প্লেটনিক্ লাভ'। চণ্ডীদাসের ভাষায় 'কামগন্ধ নাহি তায়'—মনে মনে এইজন্যে তাঁর গর্বের সীমা ছিল না। বেলার মত অমন রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া মেয়ের প্রেম লাভ করা কি সোজা কথা! একটা রাজ্যজয় করার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন, একটি নারীর হৃদয় জয় করা। অন্ততঃ তাঁর নিজের তাই ছিল ধারণা!

কিন্তু তাঁর সেই অহঙ্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছিলো যেদিন বেলা সেদিনের সে ব্যথা এতকাল পরে আবার যেন নতুন ক'রে বুকের মধ্যে অনুভব করলেন আশুবাবু। তিনি ত কিছু পান নি বেলার কাছ থেকে। বেলা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যতদিন বিশ্বজিতের কাছে ধরা দেয় নি, ততদিন তাঁর মন যেন পূর্ণ ছিল, বেলা তাঁকে ভালবাসে এই মনে ক'রে। কিন্তু সেদিন একেবারে বিষ হ'য়ে উঠলো বেলা তাঁর চোখে। বেশ মনে আছে। অনেক চেষ্টা ক'রে যখন তিনি বেলাদের ঠিকানাটা সংগ্রহ ক'রে দেখা করতে গিয়েছিলেন বেলার সঙ্গে, তখন ঘরে বিশ্বজিৎ ছিল না। বন্ধ দরজার কড়া নাড়তেই বেলা এসে কপাট খুলে দিয়েছিলো তাঁকে। সামনে যে আশুবাবুকে দেখবে বুঝি তা কল্পনাও করতে পারে নি বেলা। তাঁকে দেখে বুঝি তার বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠেছিলো। শুধু নির্মম কণ্ঠে আশুবাবু তাকে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন—'কেন আমার সঙ্গে তুমি এইভাবে

ছলনা করলে, এত বিশ্বাসঘাতকতা করলে, যদি জানতে মনে মনে যে ওকে তুমি ভালবাসো ?'

বেলার কণ্ঠ বুজে আসে আবেগে, চোখে জল ছলছল ক'রে ওঠে। বলে, 'কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নি আপনার সঙ্গে, ভগবানের দিব্যি। আপনাকে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়েছি—এখনো আমার মনে তা অবিচলিত আছে এবং চিরদিন তা থাকবে।'

দ্বিগুণ জ্বালার সঙ্গে এর জবাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন আশুবাবু। বলেছিলেন, 'বিশ্বজিৎকে বুঝি শ্রদ্ধা ভক্তির বদলে ঘৃণা করতে ? না কেবল ভক্তি শ্রদ্ধাগুলো বেছে বেছে আমার জন্যেই তুলে রেখেছিলে ?'

একটু চুপ ক'রে চোখের জল সংবরণ করতে করতে বেলা উত্তর দিয়েছিলো। 'যাঁকে ঠাকুরঘরে ঠাঁই দিয়েছি তাঁকে শোবার ঘরে নামিয়ে আনতে বলবেন না !'

'থাক্, এই ব'লে আর আমায় স্তোক দিতে হবে না। শেষকালে বিশ্বজিতের মত একটা বখাটেকে যে তুমি বিয়ে করবে তা আমি কল্পনাও করি নি। তোমার একটা 'টেস্ট' আছে, তোমার মনে একটা উঁচু আদর্শ আছে ব'লেই তোমাকে বরাবর জানতুম। ক্লাশের সব মেয়ের মধ্যে আমার চোখে তুমি ছিলে উন্নত, সকল দিক থেকে। তাই তোমাকে আমি···। থাক সে সব কথা। ব'লে আশুবাবু প্রস্থানোদ্যত হ'লে বেলা বলেছিলো, 'শুনুন, আপনি মিছিমিছি আমার ওপর অবিচার করছেন।'

'অবিচার আমি করছি সকলের ওপর—আর সবাই আমার ওপর সুবিচার করছে, না ? চমৎকার ! এই জন্যে তোমাদের বলে মেয়ে-মানুষ। তোমরা ভালটাকে চোখে দেখতে পাও না কোনদিন। শকুনের মত যত উঁচুতে ওঠো না কেন, দৃষ্টিটা থাকে সব সময় ভাগাড়ের দিকে !'

উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে আশুবাবুর কণ্ঠস্বর। বলেন, 'জানো, বিশ্বজিতের সঙ্গে কটা মেয়ের 'এফেয়ার্স' হয়েছিলো?'

'জানি! কিন্তু ওছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না আমার।'

'কি বললে?' বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে বেলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন আশুবাবু। এর পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের কারুর মুখেই আর কোন কথা জোগালো না। যেন ফুরিয়ে গেছে যা কিছু বলার। হাকিম রায় দিয়ে দিয়েছেন। উভয় পক্ষের তাই আর কিছু বলার নেই।

তবু অপরাধিনীর মত আরো মুহূর্ত কয়েক তেমনি ভাবে নীরব থেকে শেষে বেলা বললে, 'আমি নিরুপায়। কি করবো বলুন! আমার শুধু বাইরেটা দেখেছেন, ভেতরের খবর যদি কিছু জানতেন—তা হ'লে—থাক্।'

'আমি সব জানি। কিন্তু তুমি যে তার এই নীচতাকে এইভাবে প্রশ্রয় দেবে, তা ভাবি নি!'

'নীচতা?' বেলা কি বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলে। তারপর বললে, 'এমন ক'রে যে আমার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে, তাকে কি ক'রে ফিরিয়ে দেবো! আপনি ত জানেন আশুদা, আমি বড় দুর্বল! বড় স্নেহের কাঙাল!'

'এর ফল পাবে শিগ্‌গিরই হাতে হাতে, তখন বুঝবে কেন আমি এত সতর্ক করেছিলুম। তোমায় ওর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলুম।'

কথাটা ব'লে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে বেলার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার আশুবাবু কথাটা তুলে নিয়েছিলেন। 'না, না, তুমি সুখী হও—তোমায় অভিসম্পাত দিচ্ছি যেন মনে করো না! ব'লে সেই যে চ'লে এসেছিলেন, তারপর আর কোনদিন দেখা করতে যান নি।'

সেও আজ হ'য়ে গেছে কত কাল! যেন কত যুগ যুগান্তর! আজ বহুকাল পরে আবার নিজের সেই ব্যর্থতার কাহিনী যেন আশুবাবুর মনের বন্ধ কপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আশুবাবু ঘরের ভেতর উঠে যান। একটু পরেই খাবার ঘণ্টা বাজবে। 'ডাইনিং হলে' যেতে হবে, তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকেন।

হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতে আশুবাবুর মনে হয়, তবু ওই হুলিয়াটা তাঁর চেয়ে সৌভাগ্যবান। ওর মনে যে বেদনা, তার জন্ম সুখ থেকে! কিন্তু কি পেয়েছেন তিনি জীবনে!

কলেজের এই রোমান্টিক জীবন ছাড়া সংসারের কাছ থেকেই বা কি পেয়েছেন তিনি! শুধু আঘাত। একটার পর একটা আঘাত! নির্মম, হৃদয়হীন ব্যবহার। মা, বোন, স্ত্রী—কেউ তাঁকে ছেড়ে দেন নি। সে ক্ষতস্থানগুলো থেকে আজ নতুন ক'রে আবার যেন রক্ত ঝরতে থাকে। পুরনো ঘায়ে খোঁচা মেরে যেন চলে গেছে হুলিয়াটা!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, অন্ধকারে সেই গর্জমান কালো সমুদ্রটার দিকে তাকিয়ে আশুবাবু সহসা যেন সর্বাঙ্গে তারই জ্বালা অনুভব করতে থাকেন! কিছু ভোলেন নি তিনি। মনে হয় যেন সব এই সেদিনের কাহিনী! হঠাৎ বাপ মারা যাওয়ায়, বি, এ, পরীক্ষাটা আর দেওয়া হ'ল না তাঁর! সংসারের বোঝা অতর্কিতে এসে পড়লো তাঁর মাথায়। একলা তাঁর পক্ষে হয়তো সে বোঝা বহন করা সম্ভব হতো না, যদি না ছোট বোন মমতা সেদিন এসে দাঁড়াতো তাঁর পাশে!

মমতার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে আশুবাবুর।

হাঁ, জুতোশেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব করতে হ'ত মমতাকে। বাড়ির কর্তা আশুবাবু, শুধু নামে। উপার্জন ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, বা বুঝতে গেলে তাঁর চলতো না। সংসারের দৈনন্দিন হাটবাজার

তেল, নুন, পাঁচফোড়নের পিছনে না ছুটে সেই সময়টায় দুটো ট্যুইশন ক'রে অতিরিক্ত উপার্জন করতেন ব'লেই কোনরকমে ভদ্রতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বাইরের লোকেরা জানতে পারে না সংসারের কোথাও কোন অভাব-অনটন আছে কি না। অথচ লেখা-পড়ায় এমন কিছু বিদ্যাদিগ্‌গজ নন আশুবাবু যে মোটা মাইনের চাকরী চেষ্টা করলেই মিলবে! বাপ হঠাৎ মারা যাওয়ায় বি, এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নি। বাপের আফিসের বড় সাহেবকে ধ'রে একটা চাকরীতে ব'সে গিয়েছিলেন। তা না হ'লে এতগুলো প্রাণীকে হয়তো অনাহারে থাকতে হতো। তবে আফিসটা ভাল। বছরে আড়াই মাসের বোনাস, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, গ্র্যাচুইটি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইত্যাদি আছে, তা ছাড়া ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই পদোন্নতির সম্ভাবনা। এই আট বছরের চাকরী জীবনে আশুবাবু দু'বার পরীক্ষা দিয়ে যে উন্নতি করেছেন তার জন্যে আফিসের অনেকেই তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতো। তবুও আশুবাবু সংসারের খরচা মেটাতে পারেন না ব'লে সকালে ও রাত্রে সমানে দুটো ট্যুইশন করতেন। বৃদ্ধা মা, কুমারী বিবাহযোগ্যা ভগ্নী মমতা, তার সঙ্গে আর তিনটি নাবালক ভাই বোনের, দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। বাপ মারা গেলে প্রথমেই মমতা দাদাকে ব'লে স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলো। বলেছিলো, 'আমি আর পড়বো না দাদা!'

'সে কিরে, আর দুটো বছর হ'লেই তো ম্যাট্রিকটা পাশ করতিস?'

'ম্যাট্রিকটা পাশ করলেই কি অমনি দুটো হাত বেরুবে দাদা! তার চেয়ে আমার স্কুলের গাড়ি ভাড়া ও মাইনের টাকাটা বাঁচলে, আমরা খেয়ে বাঁচবো। তা ছাড়া পলটু, গোপাল, তন্দ্রাকে ত স্কুলে পড়াতেই হবে, তাদের পেছনে তোমার কত পড়বে ভেবে দেখেছো কি?'

কথাটা মমতা ঠিকই বলেছিলো, তবু বোনকে পড়াবার জন্যে বার-কয়েক মৌখিক অনুরোধ জানিয়ে শেষে আশুবাবু চুপ ক'রে

গিয়েছিলেন। তারই যখন পড়া হ'ল না, তখন বোনের কথা ভেবে লাভ কি?'

কিন্তু মমতা শুধু ওইখানেই থামলো না। দাদার ঘাড়ের বোঝা আরও লাঘব করবার জন্যে ঠাকুর চাকরকে এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করলে।

এতে আশুবাবুর মনে বড় ব্যথা লাগলো। তিনি বললেন, 'মোমি এ কাজটা কিন্তু তুই ঠিক করলি না। একে মা বাতে পঙ্গু তার উপর ইদানিং আবার প্রেসার বেড়েছে, রান্না করবে কে? তা ছাড়া চাকর না হ'লেই বা বাসনমাজা, বাট্‌না বাটার কাজগুলো হবে কি ক'রে? মায়ের শরীরের যা অবস্থা তাতে তাকে দেখতেই ত একটা লোকেব দরকার। আচ্ছা বুঝলুম সেটা না হয় তুই সামলালি, কিন্তু ওদিকটা?'

'এটাও যেমন ক'রে সামলাবো, ওদিকটাও তেমনি পারবো দাদা। তুমি এত অকর্মণ্য ভাবছো কেন তোমার বোনকে! বাবা মারা যাওয়াতে সংসারের যে আয়টা কমে গেলো, সেটাকে যতদূর সম্ভব হিসাব সঙ্কোচ ক'রে এইভাবে পুষিয়ে নিতে হবে তো দাদা! খাওয়া-পরা, বাড়ীভাড়া, ওষুধ, ডাক্তার, এগুলো বজায় রেখে এখন থেকে খরচের বাহুল্য না কমালে তুমি একা পেরে উঠবে কোথা থেকে?

মমতার কথাটা যে খুবই যুক্তিপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তবু যে ছোটবোন এতদিন ধ'রে বাবার আদরে মানুষ হয়েছে তার ওপর এক হাতে এতগুলো পরিশ্রমের কাজ চাপিয়ে দেওয়াটা কি হৃদয়হীনতা নয়? আসল কথাটা মুখে বলতে না পেরে আশুবাবু একটু থেমে ওবং ইতস্তত ক'রে বলেছিলেন, 'কিন্তু বাজার-হাট করবার তো একটা চাকর চাই-ই ভাই!'

ভগ্নীর মুখ সহসা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বললে, 'এখন তো আর

বাবা বেঁচে নেই যে তাঁর মত কতকগুলো বৃথা আভিজাত্য নিয়ে ব'সে থাকতে হবে! স্কুলের গাড়ীতে না চেপে মেয়ে পড়তে যেতে পারবে না, ট্রামে-বাসে ক'রে বাজার করতে না গেলে সম্ভ্রমের হানি হবে! যেমন অন্যসব মেয়েরা আজকাল বাজারহাট করছে আমিও তেমনি করবো!' তুমি ভাবছো কেন তার জন্যে!' ব'লে দাদাকে উৎসাহ দিয়েছিলো বেশি ক'রে।

আশুবাবু এর ওপরে আর কোন কথা বলতে পারেন নি। শুধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ছোটবোন যেমন স্বেচ্ছায় সব গুরু-দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে তেমনি অর্থের দিক থেকে কোন অভাব তিনি তাদের বুঝতে দেবেন না। বাবার যে আয় ছিল অতটা উপার্জন করা সম্ভব নয় তা জানতেন, তবু আয়ের অঙ্কটা প্রাণপণে বাড়িয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করতেন। দু'বেলা ট্যুইশান করেও আবার একটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্সী নিয়েছিলেন। যা, আসে বছরে, যথা লাভ। আফিসের অতগুলি সহকর্মী রয়েছে, আবার তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজেরও পরিচিত জন কিছু আছে! তাই সকালেও যেমন ছুটতে ছুটতে ছেলে পড়িয়ে এসে হুড়-হুড় ক'রে মাথায় দু'-বালতি জল ঢালতে ঢালতে বলতেন, মোমি ভাত বাড়, রাত্রেও তেমনি গলার টাই খুলতে ত্বর সয় না, কোনদিন দশটা, কোন-দিন সাড়ে দশটায় ঘরে ফিরে হাঁক পাড়তেন, কৈ শিগগির খেতে দে ভাই, বড্ড ঘুম পেয়েছে, চোখ চাইতে পারছি না।'

দাদার খাওয়ার কাছে বসে, বাতাস করতে করতে মমতা বলে, 'এত খাটলে কি ক'রে তোমার শরীর টিঁকবে দাদা, তুমি তার চেয়ে ইন্‌স্নিওরেন্সের কাজটা ছেড়ে দাও। ভোর ছ'টা থেকে রাত্তির দশটা পর্যন্ত কি মানুষ খাটতে পারে?'

জলের গ্লাসটায় একটা চুমুক দিয়ে আশুবাবু বলতেন, 'ছাড়তে

পারি একটা সর্তে, যদি তুই একটা চাকর রাখিস তবে। সে বাজার করবে, বাসন মাজবে, বাট্‌না বাটবে, ঘরদোর ধোয়া-মোছা করবে। কি চুপ ক'রে রইলি যে! বল, জবাব দে, কথার?'

'কিন্তু আমার তো ওর জন্যে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না।'

'কষ্ট হয় কি না হয়, তার কৈফিয়ত তো আমি তোর কাছে চাইছি না।' একটু থেমে মমতার মুখের ওপর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আবার তিনি বলেছিলেন, 'সত্যি বলছি মোমি, তুই যদি রাজী না হ'স চাকর রাখতে, তা হ'লে আমি আরও একটা ট্যুইশনি ধরবো এ মাস থেকে। তোর চেহারা কি হয়েছে দেখেছিস আয়নায় একবার?'

দাদার কণ্ঠস্বরের এই ব্যাকুলতা বুঝি মমতার অন্তরকে স্পর্শ করে। ধীরে ধীরে সে বলে, 'আচ্ছা তাই হবে দাদা!'

সত্যি, চেহারাটা খুবই খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো মমতার। একলা এতগুলো কাজ সামলানো কি সহজ কথা! সকাল থেকে উঠে যেন নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না! ঘরদোর সাফ করা থেকে শুরু ক'রে রান্নাবান্না, সংসারের যাবতীয় কাজ তো আছেই। তার ওপর আবার ছোট ভাই বোনদের পড়া ব'লে দেওয়া, বাজারের খাবার দাদার পেটে সহ্য হয় না ব'লে খাবার তৈরী ক'রে টিফিন বাক্সে ভরা। ওদিকে স্কুলের সময় হ'লে ভাইবোনদের জামাকাপড় পরিয়ে তাদের বই খাতা পেন্সিল সব গোছ ক'রে হাতে তুলে দেওয়া। মা বাতে শয্যাশায়ী, তার গায়ে হাতে পায়ে মালিশ ক'রে লিনেনের গরম কাপড় জড়িয়ে দিয়ে তার বিছানার পাশে শুয়ে কোন ভাল বই প'ড়ে তাকে শোনানো। আবার কলের জল যেই আসে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়া। আবার উনুনে আগুন দিয়ে ভাইবোনেদের জলখাবার তৈরী ক'রে রাখে, তারা স্কুল থেকে ফিরে বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই মমতার কাছে ছুটে এসে বলবে, 'দিদি বড্ড খিদে পেয়েছে।' এর ওপর আবার আছে অসুখ-বিসুখ। মায়ের

পুরনো বাত, এলোপ্যাথী ওষুধে কাজ হয় না ব'লে কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে মমতা নিজেই। সপ্তাহে একদিন ক'রে বিকেলে পলটুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যায়, আর ফেরার পথে বাজার ক'রে নিয়ে বাড়ী ঢোকে। ছোট ভাইবোনগুলোর অসুখ হ'লে যেন মাথা খারাপ হ'য়ে যায় মমতার। সংসারের সমস্ত কাজ বজায় রেখে আবার রাত্রি জেগে তাদের সেবা করে। মা নিজেই অসুস্থ, পাছে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়, সেই জন্য ছোট ভাই বোনদের নিয়ে পৃথক ঘরে মমতা শোয়।

আশুবাবু শুধু রাত্তিরটা শুতেন মার ঘরে। এ ছাড়া সংসারের আর কোন দিকে তাঁর চাইবার সময় ছিল না। শুধু মাসের প্রথমে মাইনের টাকাটা এনে মমতার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হোতেন। মমতাই সংসারের সব কিছু করে। অদ্ভুত তার কর্মক্ষমতা !

প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ ছিল মমতার মনে। যেন জীবনের একটা মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করতে চলেছে। তা সফল করার মধ্যে তার আত্মতৃপ্তির চেয়ে বেশি ছিল বংশ-মর্যাদা ও পিতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা।

সব দিকে ছিলো মমতার কড়া নজর। তাই এতটুকু অসভ্যতা ভাইবোনদের মধ্যে দেখলে তখনি শাসন করতো, তাদের সভ্যতা ভব্যতা শেখাতে লেগে যেতো !

ভাইবোনদের যত বয়েস বাড়ে তাদের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি দেয় মমতা তত বেশি। বিশেষ ক'রে ছোট বোন তন্দ্রাকে চোখে চোখে রাখে সব সময়, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তাকে তিরস্কার করে। মমতা বলে, 'তুই বড় হচ্ছিস, ক্লাস নাইনে পড়িস, এখন কি ওইভাবে দশটা পুরুষের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায়, পাঁচ জনে কি মনে করবে ?'

দিদির কথার ওপর কথা বলার সাহস তখনো হয় নি তন্দ্রার। তাই, 'আর করবো না' ব'লে তখনি ঘরের ভেতরে চ'লে যায় মুখ কালো ক'রে।

স্কুলে যাবার সময় তন্দ্রাকে মুখে পাউডার মাখতে দেখলে মমতা রাগ করে। সেদিন লম্বা বিনুনী ঝুলিয়ে তার ডগায় রঙ্গীন সিল্কের ফিতে বাঁধছিল তন্দ্রা, ঘরে ঢুকে তার মাথা থেকে টেনে ফিতেটা খুলে ফেলে দিয়ে রাগে জ্বলে উঠলো মমতা, 'লজ্জা করে না এমনি ক'রে সেজেগুজে স্কুলে যেতে—স্কুলটা কি আড্ডাখানা—সেখানে পড়তে যাস না রূপ দেখাতে যাস শুনি? যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন ওসব বেহায়াপনা চলবে না এ বাড়িতে, ব'লে দিলুম।'

নীরবে চোখের জল মুছতে মুছতে স্কুলে চলে যায় তন্দ্রা। স্কুলের আরো অনেক মেয়ে যে আরো বেশি সেজে আসে সে কথা বলতে সাহস হ'ল না। দিদিকে সে যমের মত ভয় করে। সে ভাবে, দিদি তো এমন ছিল না। ইদানীং যেন তার মেজাজটা সব সময়ই রুক্ষ হ'য়ে আছে। ভাল কথা একবারও তার মুখে শুনতে পায় না। সব সময় তাকে খিঁচোচ্ছে, এটা করবি না ওটা করবি না, ওদিকে চাইবি না, রাস্তা দিয়ে চলবি মাথা হেঁট ক'রে! তুই যে বড় হয়েছিস, এটা সব সময় মনে রাখবি!

মেয়ের এই মেজাজ লক্ষ্য ক'রে মা কি মনে ভাবেন জানি না। শুধু রাত্তিরে আশুবাবু শুতে এলে তাকে বলেন, 'হাঁরে তোদের সংসারে আর কতকাল মেয়েটা এমনি ক'রে খাটবে? ওর একটা বিয়েথার চেষ্টা কর বাবা। বয়স যে এদিকে পঁচিশ পূর্ণ হতে চললো, তার খেয়াল আছে!'

তাইত! হঠাৎ যেন আশুবাবুর বিবেক দংশন ক'রে উঠতো। কিন্তু বিয়ে যে দেবেন তার টাকা কই! তাঁর মাথার মধ্যে সব যেন কেমন

ঘুলিয়ে ওঠে! এক আধ পয়সার কাজ তো নয়। হাজার কয়েক চাই। তাদের মর্যাদা, আভিজাত্য বজায় থাকে এমন পাত্রের সঙ্গে তো বিয়ে দিতে হবে? তা না হ'লে মমতাই তো পরে তাকে অভিসম্পাত দেবে, বলবে বাবা নেই ব'লে, দাদা একটা যা তা পাত্রের গলায় তাকে বেঁধে দিয়েছে! লেখাপড়া জানে অথচ রোজগারও ভাল করে এ রকম পাত্র খুব কম হ'লেও পাঁচ হাজার টাকা খরচা না করলে মেলা যে দুষ্কর তা আশুবাবু জানতেন। আফিসের কয়েকজন সহকর্মীর বিবাহে বরযাত্রী গিয়ে নিজে চোখে দেখেছেন জিনিসপত্র দেওয়ার কি বহর!

ছেলের মনের কথা বুঝতে মায়ের দেরী হয় না। আশুবাবুকে অবশেষে চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি বললেন, 'টাকা-পয়সার কথা ভাবছিস তো? তা এক কাজ করলেই তো হাঙ্গামা চুকে যায় বাবা, তুই বিয়ে কর, সেখান থেকে যা পাওনা গণ্ডা হবে তা দিয়ে আমি মমির বিয়েটা দিয়ে দেবো!'

'তা হয় না মা। মমির বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি নিজের কথা চিন্তাই করতে পারি না।' ব'লে সেদিন চুপ ক'রে গিয়েছিলেন আশুবাবু।

মমতারও মনে দাদার কথা ভেবে দুঃখ জাগে। সারাদিন ওই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে বাড়ি ফেরে তখন এক একদিন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সে ব'লে ফেলতো, 'দাদা এইবারে তুমি একটা বিয়ে করো ভাই, একটা নিজস্ব সেবা-যত্ন করার লোক না হ'লে তোমার এ খাটুনি সহ্য হবে কি ক'রে!'

উলটো জবাব আশুবাবুর ওষ্ঠ ভেদ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতো, 'কেন, আমি কি কাউকে বলেছি যে আমার বোন আমায় যত্ন করে না, ভাল ক'রে খেতে দেয় না?'

'আহা, আমি বুঝি ওই জন্যে বলেছি!' একটু থেমে কণ্ঠে সোহাগ

ঢেলে দেয় মমতা, 'একা একা আমার ভাল লাগে না ! বৌদি এলে একটা তবু সঙ্গী হয়, দু'টো মন খুলে গল্প করতে পারি ! বলতে বলতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো। আশুবাবু দরজার পানে চুপ ক'রে তাকিয়ে থেকে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিতেন। সত্যি কি তিনি অবিচার করছেন মমতার ওপর, তাঁর বিয়ে না দিয়ে ? চিন্তা করতে করতে আবার তাঁর মনে হয় কিন্তু আজকাল অনেক বড় বড় লোকের ঘরে তো মমির চেয়ে বয়সে বড়, আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, তা ছাড়া যারা বি, এ, এম, এ, পাশ ক'রে চাকরী করছে আফিসে স্কুলে, তারাও তো অবিবাহিতা, তারাও একদিন মনোমত পাত্র পেলে তবে বিয়ে করবে ! মমতাও না হয় আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলো ! এর মধ্যে তাঁর হাতে টাকাও কিছু জমবে তখন খরচ ক'রে সৎপাত্রে বিয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে ! আবার মমতাকে নিয়ে মুস্কিলও আছে। আধুনিক মেয়েদের মত পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে ভালবেসে যে নিজের বর নিজেই ঠিক ক'রে নেবে—মা ও দাদার খরচ বাঁচিয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দুশ্চিন্তার ভার লাঘব হবে—সে পথকে ঘৃণা করে মমতা। আশুবাবু তা জানতেন। মধ্যে সে চেষ্টাও করেছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের চা খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ীতে এনে মমতার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ফল তাতে ভাল হয় নি। এই আলাপের সূত্র ধ'রে যে দু'জন বেশি ঘনিষ্ঠতা করেছিলো মমতার সঙ্গে তাদের অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলো মমতা বাড়ী থেকে ! একজনের অপরাধ তাকে হিন্দী ছবি দেখাবার জন্যে সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিলো। মমতা তার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। আর একজন একটা মূল্যবান ফরাসী এসেন্সের শিশি এনে গোপনে তাকে উপহার দিতে গেলে সেটা নিয়ে রাস্তার নর্দামায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলো,

'এসব জিনিস দিয়ে যেসব মেয়েদের মন ভোলানো যায় সে মেয়েদের জাত আলাদা, আমি নই। একটু ভুল করেছেন আপনারা!' ব'লে সদর্পে ঘর থেকে সেও যেমন বেরিয়ে গিয়েছিলো তারাও তেমনি আর কোনদিন ওবাড়িতে ঢোকে নি।

রাস্তার ওপারে যে বড় বাড়িটা তার তিন তলায় একবার এক নতুন ভাড়াটে আসে। তাদের এক ঝাঁকড়া-চুলো ছেলে তাকে লক্ষ্য ক'রে একদিন গান গেয়ে উঠেছিলো, 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।' মমতা তার জবাবে কোন কথা বলে নি, শুধু তার পায়ের একখানা পুরনো চটিজুতো এনে সেই জানালাটার সামনে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যস্ তারপর থেকে সেই দোতলার কণ্ঠস্বর আর কোনদিন শুনতে পায় নি—শেষে একদিন সে বাড়ী ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে গিয়েছিলো।

মোটকথা তার চরিত্রের একদিকে যেমন ছিল কঠোর সংযম, অন্যদিকে তেমনি পর্বতপ্রমাণ অদ্ভুত নিষ্ঠা—নীতিজ্ঞানের পবিত্রবন্ধনে যেন তার মনটা আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধা! কোথাও এতটুকু ফাঁক, এতটুকু শিথিলতা ছিল না। হেড মিসট্রেসের মত সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে যেন সে প্রতিটি পা ফেলতো।

তবুও পাথরের বুকে ফাটল ধরলে তার মধ্যে যেমন গাছ হয় তাতে আবার ফুল ফোটে তেমনি এই পঁচিশ বছরের অবিবাহিতা, কর্তব্যপরায়ণা, সঙ্গীহীনা মমতার নিরন্ধ্র-জীবনের একঘেয়ে জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারতো বৈ কি! এক একদিন জীবনটাকে যখন অসহ্য ব'লে মনে হ'ত, প্রাণ খুলে দু'টো মনের কথা বলার সঙ্গীর জন্যে আকুলি-বিকুলি করতো তার সমস্ত অন্তর, তখন সহসা ভেসে উঠতো ডাক্তার মিঃ গুপ্তর মুখখানা তার চোখের সামনে। অল্প বয়স, সুন্দর, সুপুরুষ, হাসলে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে

মুক্তোর মত দাঁতগুলো আগে ঝিলমিলিয়ে ওঠে! ভাইবোনের অসুখ হ'লেই তাঁকে ডেকে আনতো সে নিজে, তাঁর চেম্বারে গিয়ে অসুখের রিপোর্ট দিয়ে আসতো, রুগী কি পথ্য করবে জেনে আসতো।

ডিস্‌পেন্সারীতে রুগীর ভীড় যেদিন খুব, স্টেথিস্‌স্কোপটা গলায় ঝুলিয়ে ব্যস্তভাবে মমতার সামনে এসে ডাক্তার বলতেন, 'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি মিস সেন, দেখছেন ত, কি ভীড়! যাঁরা আরো আগে থেকে এসেছেন তাদের বিদায় না ক'রে—'

'ঠিক আছে, আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি যখন দেরীতে এসেছি তখন তো অপেক্ষা করতেই হবে!' ব'লে রুগীকে যে পথ্য সে দিয়েছে তা ঠিক হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতো।

ডাক্তার সব শুনে হাসিমুখে জবাব দেন, 'আপনি যে পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন, তাই ঠিক। তার কিছু পরিবর্তন করতে হবে না।' তারপর একটু থেমে আবার বলেন, 'বাস্তবিক আপনার মত নার্স করতে আমি আর কাউকে দেখি নি। রাত্তিরও তেমনি জাগতে পারেন। সেবার আপনার ছোট ভাইয়ের টাইফয়েডের সময় যা দেখেছি!'

ডাক্তারের সুন্দর মুখ থেকে ওইটুকু প্রশংসা শুনেই তার জীবন যেন ধন্য মনে হয়। আর কেউ ত তাকে এভাবে কোনদিন কোন কথা বলে নি। শুনতে শুনতে আত্ম-প্রশংসায় বুঝি বিহ্বল হ'য়ে পড়ে মমতা। সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে ডাক্তারের কথার জবাব দেয়, 'আমি ছাড়া ওদের আর কে আছে বলুন যে দেখবে!'

এক একদিন রাত্রে চোখে ঘুম আসে না কিছুতেই মমতার। ডাক্তারের মুখের ওই কথাগুলো যেন গুঞ্জন ক'রে বেড়ায় কান থেকে তার মনে! অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, ডাক্তারের সঙ্গে যার বিয়ে হবে কি ভাগ্যবতী সেই মেয়ে!

হঠাৎ মনের অবচেতনায় বুঝি জাগে একটা কথা। ডাক্তার হ'ল গুপ্ত আর সে হচ্ছে সেন। দু'জনেই বৈদ্য এবং পালটা-পালটি ঘর। এবার জোর ক'রে চোখটা বুজিয়ে, পাশবালিশটা বুকে চেপে ধ'রে ঘুমোবার চেষ্টা করে, কিন্তু পোড়া চোখে কি ঘুম আসে!

মধ্যে মধ্যে ওঘর থেকে মা ও দাদার কণ্ঠস্বর তার কানে আসে। দাদা খুব চেষ্টা করছে না কি তার বিয়ের জন্যে! দাদার মুখের ওই কথাটা শুনে শুনে এত পুরনো হ'য়ে গেছে যে ইদানীং মমতার মনে আর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না! তা ছাড়া দাদাই বা কি করবে! সে বেচারীর জন্যে বরং তার মনে অনুকম্পা জাগে। দাদা যে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জন দিয়ে তাদের জন্যে এইভাবে কঠোর পরিশ্রম ক'রে চলেছেন, তাই তাদের ভাগ্যি!

কিন্তু অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আশুবাবু বিয়ে ক'রে বসলেন তাঁর এক ছাত্রীকে, জাত কুল ভেঙে! তাঁদের মধ্যে যে বহুদিন ধ'রে গোপনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছিলো সে খবর যেমন মমতা জানতো না, তেমনি মা বা আর কারুকেই আশুবাবু কোনদিন বলেন নি। একেবারে বিয়ের দিন ঠিক ক'রে তিনি মায়ের অনুমতি চেয়েছিলেন। তারপর স্ত্রীকে এনে মমতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুই একজন সাথী চেয়েছিলি, এই নে, এইবার প্রাণ ভ'রে গল্প কর।'

মমতা দাদার বিরুদ্ধে কোনরকম বিদ্রোহ করলে না। সবটাই কঠিন দায়িত্বের মত মেনে নিলে। নতুন বৌদির আদর যত্ন করার একটা কাজ আবার তার বেড়ে গেলো। মুখ বুজে সে কর্তব্যপালন ক'রে যায়। কিন্তু বৌদির সঙ্গে কি জানি কেন প্রাণ খুলে কোন আলাপ করতে পারে না। বৌদির বয়েস তার চেয়ে অনেক কম, হাসিখুশীতে ভরা চঞ্চল চোখের চাউনি। আশুবাবুর সঙ্গে প্রথম প্রণয়ের সূত্রপাত কি ভাবে হয়, তার কাহিনী বলতে এলে মমতার

সমস্ত মন কেমন কঠিন হয়ে ওঠে। সে শুনতে চায় না, কোন কাজের অছিলায় এড়িয়ে যায়।

দাদা-বৌদির চোখমুখের অতিরিক্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস যেন সে সহ্য কবতে পারে না। নিজেকে নিয়ে দূরে দূরে সরে থাকে। একা একা চুপ ক'রে ইদানীং সবসময়ই যেন কি সব ভাবে। আশুবাবুর মনেও বুঝি ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। আগে তবু মাকে মুখে বলতেন, মমতার জন্যে বিয়ের চেষ্টা করছি, এখন একেবারে নীরব। মা যদি কোনদিন সেকথা মনে করিয়ে দিতেন তো দাদা চটে উঠে বলতেন, 'এমন কি বযেস হয়েছে তোমার মেযের, ওর চেয়ে কত বড় বড় মেযেরা সব আইবুড়ো হ'য়ে বসে রয়েছে সম্ভ্রান্ত পরিবারে।'

আশুবাবু অফিসে চলে গেলে মমতা রেগে ওঠে মায়ের ওপব। বলে, 'কেন তুমি দাদাকে বিরক্ত করো এমনি ক'রে? আমি কি বিয়ের জন্যে মরে যাচ্ছি! ফের যদি কোনদিন তুমি আমার বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাবে তো ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি!'

মেয়েকে রীতিমত ভয় করেন মা। হতাশ-সুরে শুধু বলেন, 'তোর ভালোর জন্যেই আমি যেচে গাল শুনি, আমার আর কি!'

'আমার আর অত ভালো করার চেষ্টা করো না তুমি মা। দোহাই তোমার, পায়ে পড়ি।' ব'লে মনের সমস্ত আবেগ প্রাণপণে চেপে নেয মমতা।

একদিন চিঠি লেখার কাগজ খুঁজতে গিয়ে মমতা তন্দ্রার বাক্সয় দু'খানা প্রেমপত্র আবিষ্কার করলে। স্কুলে যাওয়ার পথে পত্র বিনিময় হয়। যুবকটির মনে বড় সাধ তাকে নিয়ে একদিন সিনেমা দেখতে যায়, 'জীবন সঙ্গিনী'। কিন্তু তন্দ্রা কিছুতেই রাজি নয়। সে লিখেছে, 'তার দিদি জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না। সে যেন কোন দিন আর

তাকে ও অনুরোধ না করে। শুধু নীরবে তারা দু'জনে দু'জনকে দেখবে এই তো ভালো। আকাশ যেমন ক'রে পৃথিবীকে দেখে!'

চিঠি দু'খানা পড়েই মমতার মাথায় হঠাৎ রক্ত চ'ড়ে ওঠে। আজ বাড়ী ফিরলে হয় তন্দ্রা স্কুল থেকে—মেরে তার গায়ের ছাল-চামড়া উঠিয়ে দেবে! তারপর দাদা এলে ওই চিঠিগুলো তার হাতে দেবে!

চিঠি দু'খানা বাক্স থেকে নিয়ে নিজের আঁচলে সে বেঁধে রাখে। একটা থেকে দু'টো, দু'টো থেকে তিনটে যখন বেজে গেলো ঘড়িতে তখন আস্তে আস্তে মমতার মনের উত্তাপ কমতে কমতে যেন কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো! কেন তা সে বুঝতে পারে না। সাড়ে তিনটে বাজতেই চুপি চুপি তন্দ্রার বাক্সটা খুলে সেই চিঠি দু'খানা যেমন ভাবে সব কাগজপত্রের নিচে লুকনো ছিল, তেমনিভাবে রেখে বেরিয়ে এলো। কেউ হাত দিয়েছে বা দেখেছে যেন তন্দ্রা বুঝতে না পারে! সবচেয়ে আশ্চর্য, তন্দ্রা স্কুল থেকে বাড়ীতে ফিরলে একটা কথাও তাকে বললে না, বরং আদর ক'রে বিনুনি ঝুলিয়ে চুল বেঁধে দিলে!

তন্দ্রা অবাক হ'য়ে দিদির মুখের দিকে তাকায়! একদিন, এই বিনুনী ঝোলানোর জন্যে কত তিরস্কার করেছিলো দিদি!

রাত্রে আশুবাবু বাড়ী এলে তাকেও ঘুণাক্ষরে সেই চিঠির কথা জানতে দিলে না। শুধু অনেক রাত্তির পর্যন্ত তার চোখে যেন ঘুম এলো না। মনে মনে ছোট বোনের প্রেমাস্পদ সেই যুবকটির কথা যত চিন্তা করে তত যেন তার মন পুলকে শিহরিত হ'য়ে ওঠে।

পরের দিন স্কুলে যাবার সময় তন্দ্রার ঘরে ঢুকে মমতা বললে, 'হ্যাঁরে 'জীবন সঙ্গিনী' বইটা না কি খুব ভালো হয়েছে?'

তন্দ্রা দিদির মুখের দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তা আমি কি ক'রে জানবো, আমি কি দেখেছি!'

'না, না আমি তা বলছি না, তোর ক্লাশের মেয়েরা তো দেখেছে, তারা কি বলছে!'

'তারা তো সবাই বলে খুব ভালো হয়েছে।' ব'লেই আবার গম্ভীর হ'য়ে যায় তন্দ্রা।

আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা তার হাতে দিয়ে মমতা বলে, 'এত ভাল ছবি যখন, তুই দেখে আসিস ওটা।'

টাকাটা হাতে নিয়ে দিদির মুখের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে তন্দ্রা! ভাবে দিদির কি হ'ল। একি সেই দিদি!

বোনকে নীরব থাকতে দেখে মমতা প্রশ্ন করে, 'কি রে যাবি না?'

'আজ নয়, আমার অনেক পড়া আছে রাত্রে। তুমি টাকাটা রেখে দাও এখন, যেদিন যাবো চেয়ে নেবো!'

মমতা মনে মনে হাসে। তার সঙ্গে ছোট বোনের এই লুকোচুরি দেখে। তবু মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'ইস্কুলের বন্ধুর সঙ্গে বুঝি যাবি?'

'হ্যাঁ, দিদি। তাদের জিজ্ঞেস ক'রে তবে দিন ঠিক করবো।'

ইস্কুলে চলে গেল তন্দ্রা!

তিন দিন পরে আশুবাবু রাত্রে গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরে মমতাকে চুপি চুপি ছাদে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে নীচু গলায় বললেন, 'তন্দ্রা যে রীতিমত উড়তে শুরু করেছে, তার খবর কি রাখিস!'

মমতা বলে, 'কি রকম?'

'তাকে আজ আমি নিজ চোখে সিনেমায় দেখলুম যে!'

'ওঃ সে আমার অনুমতি নিয়েই গিয়েছিলো।' ব'লে কথাটা যখন মমতা উড়িয়ে দিতে চাইলে তখন আশুবাবুর কণ্ঠস্বর দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। শুধু সিনেমা দেখতে গেলে কিছু বলতুম না কিন্তু ওর সঙ্গে একটি বকাটে ছেলেকে দেখলুম, কি হাসি তার সঙ্গে—হাসতে হাসতে তার

গায়ে যেন গড়িয়ে পড়ছিলো। আমি যে ওর পিছনে ফার্স্ট ক্লাশে বসেছিলুম তাও জানতে পারে নি।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মমতা বললে, 'সমবয়সী কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে না হয় একটু হেসেছে তার জন্যে তুমি এত রাগ করছো কেন দাদা!'

'বলিস কি! রাগ করবো না? তারপর যদি একটা কিছু অঘটন ঘটে যায়। তখন তো আমাকেই তার ফল ভুগতে হবে! তুই ওকে বারণ ক'রে দিস আর কোন দিন যেন সিনেমায় না যায়। আর কোন ছেলের সঙ্গে যদি মিশতে দেখি তা হ'লে আমি ওর লেখাপড়া সব বন্ধ ক'রে দেবো যাতে বাড়ী থেকে আর এক পা না বেরুতে পারে কোথাও! হাঁ, আর আজ থেকে আমার অনুমতি ছাড়া ও যেন আর কোথাও না যায়।'

'বেশ।' ব'লে জোরে জোরে পা ফেলে মমতা নীচে নেমে গেল।

আশুবাবু ভেবেই পান না এর জন্য তার ওপর মমতার এত রাগ কেন। তাই আশুবাবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার মমতাকে কাছে ডেকে সেদিন বলেছিলেন, 'তুই আমার ওপর রাগ করেছিস মমি?'

মমতার দু'চোখে যেন আগুনের জ্বালা। বললে, 'রাগ আমি তোমার ওপর করি নি দাদা, তবে আমার মত ওর জীবনটাকেও যে তুমি নষ্ট করবে তা আমি হ'তে দেবো না!'

'নষ্ট! তোর জীবন আমি নষ্ট করেছি? কি বলছিস?'

নির্লজ্জের মত মমতা আবার বলে, 'তোমার চোখটা শুধু বৌদির ওপরই আছে, তাই দেখবার অবসর পাও নি আমাকে। দুর্ভাগ্য আমার দাদা!'

সত্যি কথা বলতে কি এর পর আশুবাবু সেদিন নিজের মেজাজ

ঠিক রাখতে পারেন নি। ভগ্নির এই নির্লজ্জ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'টাকা ছাড়া মেয়ের বিয়ে হয় না, তা তো জানিস্। আমার যখন টাকা নেই, তখন চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় কি!'

মমতার চোখের কোণে জল টল টল ক'রে ওঠে। বলে, 'তোমার শ্বশুর তোমাকে কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেন দাদা? বরং তুমিই আফিস থেকে টাকা ধার করেছিলে বিয়ের সময়—ভুলে যেয়ো না!'

মমতার মুখ থেকে আশুবাবু ঠিক এই রকম নির্মম কথা শুনবেন আশা করতে পারেন নি। তাই এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের প্রথম ব্যথা সামলাতে গিয়ে যখন তিনি চুপ ক'রে ছিলেন তখন মমতা দৃঢ়তর কণ্ঠে ব'লে উঠেছিলো, 'তন্দ্রার বিয়ে আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি—'

আশুবাবুর মুখ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো, 'ওই লোফার ছোঁড়াটার সঙ্গে না কি? সেদিন যার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলো?'

'না। ব'লে দৃপ্তভঙ্গীতে জবাব দিল মমতা। 'আমার এক বন্ধুর মামাতো ভাই টাটায় ভাল চাকরী করেন। চারশো টাকা মাইনে ও ফ্রি কোয়ার্টার্স!'

'টাকাকড়ি ত কিছু খরচা লাগবে!'

'কিছু না। একটা পয়সাও নয়। রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে হবে। কথাবার্তা সব আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

'তার আগে তন্দ্রাকে তাদের পছন্দ হওয়া দরকার ত?'

'পছন্দ তাদের হ'য়ে গেছে। পাত্র তন্দ্রাকে দেখেছে।'

এর পর তেজস্বিনী, কর্মনিপুণা ভগ্নির মুখের ওপর আর কোন কথা না ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শুধু আশুবাবু বলেছিলেন,

'বেশ, তা হ'লে তাই হোক। মার, তন্দ্রার, তোর বৌদির মত আছে ত?'

'তোমার মত পেলে ওদের আর কারুর অমত হবে না।'

সত্যি সত্যি তন্দ্রার বিয়েটা বিনা খরচায় মমতা যখন সুসম্পন্ন ক'রে দিলে তখন সবাই তার কৃতিত্ব দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলো। সবচেয়ে কৃতজ্ঞ হ'লেন আশুবাবু ওর প্রতি। ছোট বোন হ'য়ে কেবল বড় ভাইয়ের কাজ করলো না মমতা, যেন তাঁর চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই শিক্ষা দিলে যে মেয়ের বিয়ে বিনা পয়সাতেও দেওয়া যায়, যদি অভিভাবকরা প্রকৃত যত্ন নেন, উদাসীন না থাকেন। মমতার কথা চিন্তা ক'রে আশুবাবুর অনুতাপের সীমা ছিল না সেদিন। বোনের প্রতি অবিচার করেছেন ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে বার বার।

কিন্তু একটা বছর বোধ হয় তখনো পুরো কাটে নি, নতুন সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন আশুবাবু। তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা আশুবাবুর কানে কানে একদিন বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে, তোমার আদরের বোন কখন যে ছোট ভগ্নিপতির সঙ্গে কেলেঙ্কারী ক'রে বসে আছে আমরা কেউ জানতে পারি নি।'

'তার মানে! বলছো কি!'

মুখটা স্বামীর কানের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পূর্ণিমা ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'ও জিনিসটা ত চেপে রাখা যায় না, কদিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো। তাই সেদিন চেপে ধরতেই সে কেঁদে ফেললো।'

সঙ্গে সঙ্গে আশুবাবুর মাথায় যেন খুন চেপে গিয়েছিলো। তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে, ঘরের এক ধারে তরকারীর ঝুড়িতে

যে কুটনো কোটার ধারালো বঁটিটা ছিল সেটা হাতে ক'রে দরজার খিল খুলতে গেলেন, 'আজ খুন ক'রে ফেলবো মমিকে। এত বড় স্পর্ধা! আমাদের বংশের মুখে কালি দিলে!'

পূর্ণিমা ওর হাতটা চেপে ধ'রে বললে, 'কি ছেলেমানুষি করছো।'

'একে তুমি ছেলেমানুষি বলো? এই জন্যে বুঝি নিজে পাত্র বেছে ছোট বোনের বিয়ে দিয়েছিলো ওখানে!'

পূর্ণিমা চাপা গলায় বললে, 'তা ওর দোষ কি! ও ত মেয়েছেলে! ওর জীবনটাকে ত তুমি নষ্ট ক'রে দিয়েছো। আহা, এতদিন ওর কোন বিয়ের ব্যবস্থা করো নি। অমন বুদ্ধিমতী মেয়ে। জ্ঞান বিবেচনা, কর্তব্যবোধ, কোন দিকেই যার কোন ত্রুটি নেই, তাকে চোখে দেখলে কি কোন পুরুষ কামনা না ক'রে থাকতে পারে? আমি তাই ওদের কারো কোন দোষ দিই না। সব দোষ তোমার! তুমি বড় ভাই হ'য়ে বোনের প্রতি কর্তব্য না ক'রে নিজেই আগে থাকতে বিয়ে ক'রে বসেছো!'

আশুবাবুর রাগ নিমেষে পড়ে যায়। তিনি বলেন, 'মা শুনেছেন এ কথা? তাঁর কি মত?'

পূর্ণিমা বলে, 'তাঁর মতও এই। তিনি বলেন, মমির কি দোষ? ও তো মেয়েছেলে, ওর জীবনটাকে তুমিই দিয়েছো ব্যর্থ ক'রে। তোমার চোখের সামনে ওর বয়েসটা গেল। তুমি চোখ বুজিয়ে ছিলে।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আশুবাবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'কিন্তু তন্দ্রার কাছে আমি কি ক'রে মুখ দেখাবো!'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। সে ব্যবস্থাও তোমার বুদ্ধিমতী বোন নিজেই করেছে। তোমার বোন ত অবুঝ নয়। সে নিজে সব কথা খোলাখুলিভাবে তন্দ্রাকে বলেছে।'

'অ্যাঁ—বলো কি! ওর চেয়ে বয়সে কত ছোট তন্দ্রা, জানো? মমির লজ্জা করলো না! যার এত বড় সর্বনাশ করলে তার কাছে নিজে মুখে প্রকাশ করলে কথাটা?'

'না। বরং সে ভালই করেছে।' ব'লে পূর্ণিমা দৃঢ়তর কণ্ঠে বললে, 'তন্দ্রা তার জবাবে কি বলেছে জানো? সেকথা শুনলে তুমি আরো অবাক হবে।'

'কি বলেছে!' আগ্রহ চেপে রাখতে পারেন না আশুবাবু।

'সে অনেক আগেই না কি বুঝতে পেরেছিলো কিন্তু কিছু বলে নি, শুধু দিদির নিষ্ফল জীবনের কথা ভেবে বরং তার প্রতি করুণাই করেছিলো! তোমার বোন তার দু'টো হাত ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো, আমি তোর প্রতি যে অবিচার করেছি, তার জন্যে ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই আমার। ভেবেছিলুম, এ কালামুখ আর তোকে দেখাবো না। তুই জানতে পারার আগে এমন জায়গায় চলে যাবো যে আমার নাগাল আর জীবনে কোনদিন কেউ পাবে না। কিন্তু কে যেন আমার মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, না তাতে আরো পাপ, তাই আমি আত্মহত্যা করার আগে, তোর কাছে মাপ চেয়ে অপরাধ স্বীকার ক'রে চলে যেতে চাই। তোর বর নিখিলের কোন দোষ ছিল না। আমিই তাকে নরকের পথে হাত ধ'রে টেনে নামিয়েছি। তাকে তুই ক্ষমা করিস ভাই।'

এই পর্যন্ত বলে পূর্ণিমা তার ভিজে চোখের ওপর দু'বার হাত বুলিয়ে আবার স্বামীকে বললে, 'তন্দ্রা কিন্তু এর জন্যে এতটুকু রাগ করে নি দিদির ওপর। বরঞ্চ তার হাত দুটো ধ'রে বলেছে, 'দিদি, তুমি আত্মহত্যা করবে কেন? রেজেস্ট্রী ক'রে তোমরা দু'জনে বিয়ে ক'রে ফেলো। আমি মনে করবো আমার স্বামী অন্য কোন

মেয়ের প্রেমে প'ড়ে আমায় ত্যাগ করেছে। এমন ত আজকাল হামেশাই হচ্ছে।'

'না-না তা হয় না। ব'লে মমতা যেমন ডুকরে কেঁদে উঠলে তন্দ্রাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলো, কেন তা হবে না। আমি মনে করবো আমার স্বামী আমায় ডিভোর্স করেছেন। তা ছাড়া আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট—পরে আবার কাউকে বিয়ে ক'রে নিতে কতক্ষণ। তুমি সুখী হও দিদি, তোমার জীবনটা পূর্ণ হোক, তুমি আমাদের সকলের জন্যে যে আত্মত্যাগ করেছো, আমরা তার কিছু প্রতিদান দিতে পারি নি! আমি সত্যি সত্যি খুশি হয়েছি এর জন্যে!'

'মমতা এর জবাবে, বোনের হাত দু'টো জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলো, কিন্তু দাদা শুনলে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না আমি জানি। না-না কাজ নেই—তার চেয়ে আমিই আত্মহত্যা ক'রে এ পোড়া জীবনের সব জ্বালার হাত থেকে রেহাই পাই—আমায় বাধা দিস্ নি বোন। আমায় ও অনুরোধ করিস নি।'

'না। আমি নিজে দাদাকে গিয়ে বলবো। দাদা কিছু মনে করবে না। আমি তাকে ভাল ক'রে সে কথাটা বুঝিয়ে দিতে চাই দিদি। একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা-করা তার মত ভাইয়ের উচিত হয় নি। আজ আমাকে উপলক্ষ ক'রে তোমার নারী জীবনে এতটুকু যদি সাফল্য এসে থাকে ত, তার জন্যে আমি দুঃখিত নই, বরং গর্ব বোধ করছি। এ আমার আত্মবলি নয়, আত্মত্যাগ দিদি! তুমি আমার ঢের করেছো, এতদিন পরে তোমাকে যে কিছু দিতে পেরেছি, তার জন্যে আমি ধন্য।'

'মমতা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তন্দ্রার হাত ধ'রে অনুরোধ করে, না ভাই, দাদাকে তুই কিছু বলিস না।'

'কেন বলবো না! নিজে সাত তাড়াতাড়ি প্রেম ক'রে বিয়ে ক'রে

বসলো আর এত বড় বোনটার যে বিয়ে দেওয়া কর্তব্য সেটা একবার ও ভেবে দেখলে না! উল্টে তাঁর স্ত্রীর সেবা করার জন্যে তোমায় বিনা মাইনের দাসী নিযুক্ত করেছে এমনি মনোভাব; তার যত্নের এতটুকু ত্রুটি হ'লে আবার রাগ ঝাল! আমি সব বুঝি, আমাকে এত ছেলেমানুষ ভেবো না।'

পূর্ণিমা বলে, 'ওরা দুই বোনে যখন এইসব কথা বলছিল আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। কাজেই তুমি মিছিমিছি কেন উত্তেজিত হচ্ছো, কেন রাগ করছো ওদের ওপর? বাস্তবিক আমরা সকলেই অন্যায় করেছি মোমির প্রতি। তুমি যদি কথাটা একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখো তা হ'লে বুঝতে পারবে!···

আশুবাবুর চোখের সামনে তাঁর অতীত যেন সহসা মুখর হয়ে ওঠে। বহুদিন পরে আবার তাঁর বুকের মধ্যেটা টন্‌টন্ করতে থাকে কিসের বেদনায়। তিনি আর ভাবতে পারেন না।

তবু এই প্রসঙ্গে নিজের দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি সহসা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে আশুবাবুর মনের মধ্যে বিশেষ একটি স্থানে। সত্যি স্ত্রীর আচরণ তাঁর কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকে। যদিও এ নিয়ে বাগবিতণ্ডা ক'রে তিনি কোনদিন পূর্ণিমার সঙ্গে অশান্তির সৃষ্টি করেন নি অথবা স্ত্রীব কাছে কতটুকু পেলেন বা না পেলেন, তার চুলচেরা হিসেব ক'রে আদায় উশুলের চেষ্টাও করেন নি। বরং দিনের পর দিন নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এ সবের উর্দ্ধে এক জ্ঞানের জগত রচনা ক'রে, দার্শনিকের মত আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন এই ভেবে যে, স্ত্রীলোকের প্রেম ও ভালবাসা ওই সমুদ্রের ফেনার মত। কিন্তু সেদিন যেন কে তাঁর কানে কানে বলতে লাগল, 'ভুল, শুধু ভুল। তিনি এতদিন ভুলের তপস্যা করেছেন। ওই অনন্ত নীল সমুদ্রের

চেয়েও বুঝি আরো গভীর অতলস্পর্শী মানুষের মন। নারীর বুকের এক কোণে কোথাও এতটুকু বাসা যদি পুরুষ না বাধতে পারে, তা হ'লে তার জীবন বৃথা, জন্ম ব্যর্থ।'

সহসা আশুবাবুর অন্তরে যেন কিসের এক হাহাকার ওঠে! তবে কি এতদিন তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করেছেন। মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছেন? হ্যাঁ। তাই। সামান্য একটি ঘটনা তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

এই ত সেদিনের কথা। অতি তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যেন আশুবাবু তাঁর জীবনের ব্যর্থতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেন।

একদিন তিনি স্ত্রীর জন্যে শাড়ী কিনতে গিয়েছিলেন দোকানে!

তাকে দেখে সবাই মনে মনে বিরক্ত। মালিক থেকে দোকানের কর্মচারীরা পর্যন্ত। একখানা শাড়ী কিনতে এসে এতক্ষণ সময় যদি একটা খরিদ্দার নষ্ট করে তা হ'লে কার ভাল লাগে? বিশেষ পূজোর মরশুমে। তবু খরিদ্দার লক্ষ্মী, মনে ক'রে মুখে প্রশান্ত হাসি টেনে রেখে একখানার পর একখানা শাড়ী আশুবাবুর কোলের কাছে ফেলে দিচ্ছিল কর্মচারীরা। দোকানের ভেতরে দুপুরের ঝোঁকে নিরিবিলি দেখে কাপড় কিনতে ঢুকেছিলেন তিনি। সাদা চাদর পাতা ফরাশের ওপর তাঁর মত আরো বহু খরিদ্দার বসে কাপড় কিনছিল। কিন্তু আশুবাবু একখানা শাড়ী কিনতে গিয়ে একেবারে শাড়ীর সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। দিক্‌নির্ণয় করতে না পেরে অকূল সমুদ্রে নাবিকের যেমন মনোভাব হয় তাঁর অবস্থা সেদিন হয়েছিল বুঝি অনেকটা সেই রকম।

দেহটা এলিয়ে দিয়ে তিনি বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন পাখার নীচে, তবু চকচকে টাকটা বারবার ঘেমে উঠছিল। চশমার ভেতর

দিয়ে বিশেষজ্ঞের মত শাড়ীর ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে, কখনো বা চোখের কাছে তুলে ধ'রে পরীক্ষা করছিলেন—কার জমিটা খাপি, কোন্‌টা বেশী মিহি, কোন্‌টার পাড়ের নক্সা ভাল, কোনটার বা আঁচলার জরির কাজ তেমন সুবিধার নয়। মোট কথা কোনটাই আর ঠিক তাঁর পছন্দসই হচ্ছিল না। যদি বা কোন একটা শাড়ীর রং পছন্দ হয় ত পাড়ের ডিজাইনটা ভাল লাগে না, আবার যদি বা দু'টোই মনের মত হয় ত কাপড়ের জমিটা অত্যন্ত খেলো ঠেকে।

আশুবাবু তখন সামনের এক বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ঠিক এই রকম রঙের সঙ্গে এই জমির ওপর বেশ বুটিদার কাজ অথচ আঁচলাটায় এই ধরণের জরী দেওয়া, একখানা দেখাতে পারেন ?'

কর্মচারীটি যেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিল। এই দোকানের, ঠিক সেই জায়গাটিতে বসে তেইশ বৎসর ধরে সমানে খরিদ্দারদের শাড়ী বিক্রী করেছে, কত পূজোর সেল্ তার হাতের তলা দিয়ে গলে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠলো, 'ওরে ঢাকাই বুটি, এগারো ছেচল্লিশ রংদার সরেশ রে।'

কাঁচের আলমারীর পাল্লা সশব্দে সরিয়ে কাপড়ে জড়ানো একটা শাড়ীর বাণ্ডিল তৎক্ষণাৎ একজন পিছন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তার সামনে। বৃদ্ধ কর্মচারীটি সযত্নে বাঁধন খুলে তিনচারখানা শাড়ীর ভাঁজ খুলে আশুবাবুর কোলের ওপর বিছিয়ে দিলে। রঙ্, বুটি ও আঁচলার জরি সব মিলিয়ে চড়া বৈদ্যুতিক আলোতে শাড়ীগুলো ঝলমল করতে লাগল।

তখন ওর মধ্যে থেকে একখানা বেছে নিয়ে আশুবাবু সেই বৃদ্ধটিকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা এই রঙ্‌টা কেমন হবে বলুন ত ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, 'ফর্সা মেয়েদের খুবই ভাল মানাবে। আপনার মেয়ের গায়ের রঙ্ কেমন ?'

মেয়ে ! মুহূর্তে আশুবাবুর কানের ডগাটা বুঝি লাল হয়ে উঠেছিল। মেয়ে কোথায় ! আরে মেয়ের জন্যে হ'লে এত দুর্ভাবনার কি ছিল, এতক্ষণে একশোখানা কিনে তিনি ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে হাওয়া খেতেন। এ যে একেবারে খাস মহাবানীর শাড়ী, এত মাথা ব্যথা ত সেইজন্যে ! কিন্তু বাইবের লোকের কাছে ত মুখ ফুটে এসব বলা যায় না, তাই বার দুই ঢোক গিলে আশুবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, মানে, ওই ফরসার দিকেই বলতে পারেন।'

'তা হ'লে, এটাই নিয়ে যান।' ব'লে কাপড়টা বেঁধে দেবার জন্যে উদ্যত হ'লে, চট্ ক'রে সেটা নিয়ে আশুবাবু তাঁর পাশের ছোকরা বাবুটিকে একবার প্রশ্ন করলেন, 'দেখো ত ভাই, এর রঙ্‌টা কেমন।'

মুচকী হেসে যুবকটি বললে, 'চমৎকার। ফর্সা রঙে বেশ ম্যাচ করবে !'

'আচ্ছা, তা হ'লে এটাই দিন।' ব'লে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন আশুবাবু। অর্থাৎ এ শাড়ী পূর্ণিমাকে ভাল বলতেই হবে ! শুধু তাঁর একার পছন্দ নয়, একজন বৃদ্ধ, তার সঙ্গে আবার এক যুবককে দিয়েও তিনি সেটা সমর্থন করিয়ে নিয়েছেন ! মানিব্যাগ খুলে টাকা দিতে গিয়ে আশুবাবু ভাবতে লাগলেন, এ শাড়ী দেখে অন্তত পূর্ণিমাকে বলতেই হবে যে তার টেস্ট আছে।

সত্যি এ ক্ষোভ কোনদিন গেল না আশুবাবুর। যখনই যে শাড়ী তিনি নিজে পছন্দ ক'রে কিনে আনেন, কিছুতেই তা মনঃপুত হয় না পূর্ণিমার। প্যাকেটটা খুলেই মুখ বেঁকিয়ে হয় বলবে, ম্যাগো এ রঙ্ আবার ভদ্রলোকে পরে ? নয়ত পাড় নিয়ে কিংবা ডিজাইন নিয়ে তর্কাতর্কির পর সে কাপড় তাঁকে ফেরত দিতেই হবে, তবে যদি

গৃহের শান্তি বজায় থাকে। সেইজন্যে এতকাল তিনি ও কর্মটা আর নিজে করেন নি। বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার পছন্দ মত শাড়ী এবার থেকে নিজেই কিনে নিয়ো দোকানে গিয়ে।'

পূর্ণিমা তার উত্তরে বলেছিলো, 'তুমি রাগ করো না, পছন্দ বলতে যা বোঝায় তা তোমার একেবার নেই। আজ পর্যন্ত তুমি একখানা শাড়ীও আমার মনের মত কিনতে পারো নি।'

'যে মনের মত আনতে পারে, তাকে কিনতে দিয়ো, মিছিমিছি আমাকে দিয়ে এ প্রহসন করানোর দরকার কি!' ব'লে সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবুর মনে সাময়িকভাবে ব্যথা লাগলেও এ বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল যে রুচিজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ তাঁর যথেষ্টই আছে। কেন না সব স্ত্রীরাই স্বামীদের সম্বন্ধে, শাড়ী ও গহনা কেনার ব্যাপারে ওই একই রকমের বিরূপ মনোভাব যে পোষণ করে তা তিনি জানতেন।

পূর্ণিমারও যে নিজের খুব রুচিজ্ঞান ছিল তা নয়! তবু পাছে তাঁর কাছে হার মানতে হয়, এই জন্যে প্রথমটা তার কলেজে-পড়া ছোট বোনকে সঙ্গে ক'রে শাড়ী কিনতে যেতো। তারপর সে বোনের বিয়ে হয়ে গেলে পাশের বাড়ীর ভাড়াটেদের ছেলের বৌকে নিয়ে দুপুরের দিকে বালীগঞ্জে যেতো মার্কেটিং করতে। কিন্তু সে বৌও যখন তিন চার ছেলের মা হয়ে গেল তখন নীচের তলার ভাড়াটেদের ছেলে তরুণকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতো বাজার করতে।

নিজের পছন্দর ওপরেও যে পূর্ণিমার আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল সেকথা বাইরের লোকের কাছে যেমন প্রকাশ করতো না, একেবারে সবচেয়ে নিকটতম মানুষটিকেও জানতে দিতে তেমনি বুঝি তার মর্যাদায় বাধতো। কিংবা তার যে বয়েস হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রুচিজ্ঞানও পুরণো হয়েছে সে বিষয়ে অতি মাত্রায় সচেতন ছিল।

তাই স্বামীকে গোপন ক'রে নিজের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে সব সময় তরুণ তরুণী—বিশেষ ক'রে যাদের চোখ আধুনিক কালের রঙে ভরপুর তাদের সাহায্য নিতো।

আশুবাবু স্ত্রীর মনোভাব বুঝতেন। কিন্তু চুপ ক'রে থাকতেন, পাছে সত্যি কথা শুনলে পূর্ণিমা মনে ব্যথা পায়। কি দরকার স্ত্রীর সাজ-সজ্জার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার যাতে সে খুশি হয় হোক। এমনি একটা উদাসীন মনোভাব সর্বদা পোষণ করতেন।

তবু এক একদিন পূর্ণিমাকে একটা হু'টো বিরুদ্ধ কথা না বলে পারতেন না। সেদিন একটা রঙচঙে ছাপা শাড়ী পরে সিনেমা দেখতে যাবার সময় পূর্ণিমা এসে দাঁড়ালো আশুবাবুর সামনে। একটা মোটা ইংরিজী বই মুখে দিয়ে তিনি তখন ইজিচেয়ারে ছিলেন অর্দ্ধশায়িত।

চাবিটা আশুবাবুর বুকের ওপর ফেলে দিয়ে পূর্ণিমা বললে, 'দেখো ত এ শাড়ীটা ভাল হয় নি ?'

ইতিপূর্বে যখনই কোন শাড়ী কিনে এনে পূর্ণিমা এইরূপ প্রশ্ন করতো, আশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে মামলা ডিস্‌মিশ্‌ ক'রে দিতেন। 'বাঃ, বেশ হয়েছে।' কিন্তু সেদিন হঠাৎ বলে ফেললেন, 'না এটা মোটেই ভাল মানাচ্ছে না তোমাকে—বিশ্রী রঙ্‌চঙে।'

'বিশ্রী, সুশ্রীর তুমি কি খবর রাখো !' ব'লে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পূর্ণিমা বললে, 'জানো, তরুণ বলছিল আজকাল তাদের ইউনিভার-সিটীর মেয়েরা সব এই রকমের শাড়ী পরে আসে।'

'তা আসুকগে ! কিন্তু এর মধ্যে সত্যিকারের কোন রুচি নেই !'

তৎক্ষণাৎ পূর্ণিমা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল এবং আশুবাবুর' কানে এলো তরুণের কণ্ঠস্বর, 'বৌদি, সত্যি কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায় এই শাড়ীটা !'

'তোমার দাদার কিন্তু এটা পছন্দ হয় নি ! যত বুড়ো হচ্ছে তত যেন নেমে যাচ্ছে সবদিকে ! জীবনের কোথাও যদি তার কোন সৌন্দর্যবোধের পরিচয় থাকে !' ব'লে গজগজ ক'রে আপন মনে বকতে বকতে তরুণের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সিনেমা দেখতে যাবার জন্যে !

আশুবাবু জানতেন, তরুণ ছেলেটিকে বড় ভালবাসে পূর্ণিমা। শুধু সে শিক্ষিত ও অমায়িক প্রকৃতির বলে নয়—সুন্দর তার রুচিজ্ঞান। পূর্ণিমা ইদানীং যা কিছু সৌখীন জিনিস সব তাকে দিয়ে কেনায়। বৌদিদির মুখে নিজের রুচির প্রশংসা শুনে তরুণও যেন কেমন গদ-গদ হয়ে ওঠে। শুধু শাড়ী নয়, ঘরেব পর্দা, ফুলদানী থেকে আরম্ভ ক'রে নতুন ডিজাইন-এর বেড্-কভার্ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে ঘুরে ঘুরে কিনে এনে দেয় তরুণ। বৌদিদির চোখ হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুখ হাসির ঝলকে দীপ্ত হয়—সেইটুকুই তার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। পূর্ণিমাকে সকল দিক থেকে আধুনিকা ক'রে তুলতে সে যেন সবসময় সচেষ্ট।

দূব থেকে সবই লক্ষ্য করতেন আশুবাবু কিন্তু মুখে কোন প্রতিবাদ করতেন না।

সিনেমা, থিয়েটার বা কোন কিছু জিনিস কেনবার জন্যে বাইরে বেরুতে গেলেই পূর্ণিমা তাই তরুণকে সঙ্গে নিয়ে যায়। এমন কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী যেতে গেলেও তরুণের কলেজের ছুটির ওপর সে নির্ভর করতো।

আশুবাবু এতে কোন আপত্তি করতেন না। বরং তাকে যে তরুণ এইসব বাজে ঝামেলার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে সেজন্যে তার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ হন। এবং তরুণকে মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতে বলতেন পূর্ণিমাকে।

বলাবাহুল্য, পূর্ণিমা এতে আরো বেশী যেন খুশি হয়।

পূর্ণিমার মনের সবটুকু স্নেহ ও বাৎসল্য যে এই ছেলেটি কখন কেমন ক'রে কেড়ে নিয়েছিল তা সেও জানতে পারে নি। তারই মনের দর্পণে সব সময় পূর্ণিমা যেন নিজেকে দেখে সুখ পেতো, আনন্দলাভ করতো।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল তরুণের দাদার বিয়ে হয়ে যেতে। তরুণ তার সুশ্রী, তরুণী, শিক্ষিতা বৌদিকে দেখে একেবারে ভুলে গেল পূর্ণিমাকে। এখন বৌদিকে নিয়ে সে সিনেমায় যায়, তাঁকে বাপের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসে, আবার তাঁর ভারী সুটকেশটা নিজেই সেখান থেকে বয়ে আনে। সব সময় বৌদিকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে ওপরে আসার অবসর পায় না।

এক একদিন পূর্ণিমা চা খাবার নেমন্তন্ন করলে তবে খেতে আসতো, কিন্তু সেই সময়টুকুও যেন তার কাছে মনে হতো বাজে খরচা। এর চেয়ে শিক্ষিতা বৌদির সঙ্গে বসে রাজনীতি থেকে শুরু ক'রে সিনেমা অভিনেত্রীদের জন্মকুণ্ডলী আলোচনা করাও যেন ঢের বেশী সুখের!

আশুবাবু তরুণের এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন।

পূর্ণিমা সব খবরই রাখে। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে, পরের ছেলেকে কি কখনো কেউ আপন করতে পারে! রক্তের সম্পর্কটাই যে সবচেয়ে বড়। কাজেই তরুণের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক!

মনের সঙ্গে এমনি একটা দ্বন্দ্ব চলে তার! এখনো পর্যন্ত কতটুকু আধিপত্য তার ওপর করা চলে, মধ্যে মধ্যে সেটা যাচাই করার জন্যে তাকে কিনতে দিতো এটা ওটা।

একবার তার বৌদি যখন বাপের বাড়ী গিয়ে বাস করছিল, পূর্ণিমা তার সঙ্গে পূর্বের মত আবার সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্যে একটা দিন স্থির করলে।

সেদিন কি জানি কেন নিখুঁত ক'রে সাজলো পূর্ণিমা। ভাল দামী বিলীতি 'পেণ্ট' অনেকক্ষণ ধ'রে মুখে ঘসলো, এবং সবচেয়ে যে শাড়ীটা ছিল তরুণের প্রিয়, সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুঁচিয়ে আঁটসাট ক'রে পরলে। তারপর আয়নায় বার কতক মুখ দেখে প্রস্তুত হয়ে ভেলভেটের দামী স্লিপারটা পায়ে দিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো। দ্রুত পা ফেলে ওপরে উঠে এসে তরুণ মুখটা সিঁটকে বললে, 'এঃ একি করেছেন, বিশ্রী দেখাচ্ছে—ও শাড়ীটা পরে গেলে আমি কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবো না।'

প্রথমটা পূর্ণিমা ভেবেছিল বুঝি তরুণ রসিকতা করছে তার সঙ্গে। হয়ত এখনি তার বেশভূষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না তরুণ। বরং মুখটা গম্ভীর ক'রে বললে, 'এখনো কি এই শাড়ী পরার বয়েস আছে আপনার, খুলে ফেলুন—একেবারে বিশ্রী দেখাচ্ছে!'

আশুবাবু ঘর থেকে সবই শুনেছিলেন। এবং বলাবাহুল্য মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন!

কিন্তু এই কথার মধ্যে দিয়ে যে কত বড় আঘাত সেদিন তরুণ পূর্ণিমাকে দিয়েছিল তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। মাত্র দেড় বছর আগে যে শাড়ী পরলে তরুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো খুশিতে, এই কটা মাসের মধ্যেই তা পরলে তাকে এতই বিশ্রী দেখাচ্ছে! আর সবচেয়ে বড় কথা এরি মধ্যে তার বয়েস এতো বেড়ে গেল!

এরপর থেকে পূর্ণিমার জীবনে দেখা দিল অদ্ভুত এক পরিবর্তন। সাজগোজ আমোদ-আহ্লাদ সব সে ত্যাগ করলে। আশুবাবুকে তাগাদা দিয়ে অফিস-লাইব্রেরী থেকে বই আনাতো এবং তার মধ্যে সব সময় মনকে ডুবিয়ে রাখতো।

আশুবাবু গোপনে স্ত্রীর মনের সব কিছু খবরই রাখতেন, কিন্তু মুখে

এমন ভাব দেখাতেন যেন কিছুই জানেন না। তিনি কেবল জানতেন যে আজকাল তরুণ বড় একটা এ বাড়ীতে আসে না। তবে পূর্ণিমার ভেতর যে তার জন্যে কোন পরিবর্তন এসেছে সে বিষয় কিছুই খোঁজ রাখতেন না। তাই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবারও পূজোর শাড়ী কেনবার জন্যে টাকা যখন দিতে গেলেন স্ত্রীর হাতে তখন মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে পূর্ণিমা শুধু বললে, 'সারাজীবন ধ'রে নিজের শাড়ী ত নিজেই কিনে মলুম, তোমার কি একবারও ইচ্ছে করে না কিনে দিতে? যদি তোমার মন থেকে সায় না দেয় ত চাই না আমি শাড়ী!'

আশুবাবু প্রথমটা স্ত্রীর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তাই অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন, 'বেশ উল্টো চাপ দিতে শিখেছো ত! আমার কেনা যখন তোমার পছন্দ হয় না তখন কেন মিছিমিছি—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পূর্ণিমা জবাব দিলে, 'থামো! ক'বে একবার বলেছিলুম, সেই কথাটাই আজো মনে ক'রে রেখেছো। এই এত বছর বিয়ে হয়েছে, ক'বার নিজে থেকে শাড়ী কিনে এনে দেখছো আমার পছন্দ হয়েছে কি না?'

মেয়েরা যে এমনি অবুঝ হয়, তা তিনি জানতেন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে নিজেই এবার সোৎসাহে স্ত্রীর শাড়ী কিনতে গিয়েছিলেন।

এ শাড়ীখানা যে ভাল এবং পূর্ণিমার পছন্দ হবেই কেন জানি না সে সম্বন্ধে তিনি এবার সুনিশ্চিত হয়েই ফিরলেন। কিন্তু বাড়ীতে এসে শাড়ীখানা যখন নিজেই বাক্স থেকে খুলে বার ক'রে তার সামনে ধরলেন তখন পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো।

শাড়ীটা হাতে তুলে নেওয়া মাত্র পূর্ণিমার চোখ মুখ, দেহের প্রতিটি রেখা যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। তারপর ছুঁড়ে সেটাকে

বারান্দায় ফেলে দিয়ে বললে, 'ঠাট্টা করবার জন্যে এই শাড়ী কিনে এনেছো, না পাঁচজনে আমার পেছনে হাততালি দেবে, সেটা দেখবে বলে এই বুটিদার রঙীন জরি দেওয়া শাড়ী আমার জন্যে কিনেছো!'

ভয়ে ভয়ে আশুবাবু শুধু বলেছিলেন, 'জানো এটা এ বছরে নতুন উঠেছে, সবচেয়ে আধুনিক ডিজাইন।'

বিকৃত কণ্ঠে আশুবাবুর কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে করতে পূর্ণিমা জবাব দিয়েছিল, 'আধুনিক ডিজাইন! তাই বুঝি আমার মত আধুনিকাকে পরাবে বলে এনেছো? লজ্জা করছে না আবার ওকথা বলতে! আমার বয়েস কত হয়েছে জানো? নাই বা ছেলেপুলে হলো।'

নিমেষে তার চোখ দু'টো জলে ভরে উঠলো। মনের সমস্ত আবেগ যেন কণ্ঠে এসে আশ্রয় নিল। উদ্‌গত অশ্রু দমন করবার চেষ্টা সত্ত্বেও যেন তা বন্যার মত সংযমের সকল বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো। আঁচলের মধ্যে চোখ মুছতে মুছতে পূর্ণিমা অভিযোগ করলে, 'যখন পরবার বয়েস ছিল তখন তুমি ছিলে চোখ বুজে, আর এখন এসেছো অপমান করতে, না? বুঝি না ভেবেছো তোমার মনের কথা আমি?' ব'লেই সহসা উন্মাদিনীর মত চীৎকার ক'রে উঠলো, 'শিগগির ফিরিয়ে দিয়ে এসো ও শাড়ী—এখনি—এই মুহূর্তে--নইলে আমি ওকে উনুনের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবো! নিয়ে যাও শিগ্‌গির—আমার চোখের সামনে থেকে, নিয়ে যাও বলছি!'

বেচারী আশুবাবু! তখনো আপিসের জামা কাপড় খোলেন নি। সুড়সুড় ক'রে আবার শাড়ীটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরত দিতে গিয়েছিলেন দোকানে।

হোটেলের ঘর কখন শূন্য হয়, কখন আবার নতুন যাত্রী এসে

সেই শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে দেয়, সে খবর রাখবার যেমন অবকাশ ছিল না আশুবাবুর তেমনি প্রবৃত্তিও হতো না।

এখানে তিনি এসেছেন এই অল্প দিন। এরি মধ্যে কত লোক এলো এবং চলে গেল তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে! শুধু খেতে গিয়ে টেবিলে বসে পুরণো মুখ দেখতে না পেলে ভাবেন, হয়ত চলে গেছে। আবার সেইখানে নতুন মুখ দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না, কে নবাগত। কিন্তু সে শুধু চকিতের জন্যে! শূন্য প্লেট কোলে ক'রে বসে বাবুর্চির টেবিল পরিক্রমা ক'রে তাঁর সামনে আসতে যতটুকু বিলম্ব, সেই বেকার অবকাশটুকু!

কিন্তু সেদিন রাত্রে খেতে গিয়ে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো! একেবারে তাঁর সামনে টেবিলের ওপরে মুখোমুখি এসে যে একজোড়া দম্পতী বসলো, তার মধ্যে স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রেই তিনি শিউরে উঠলেন! আরে, এ যে বেলা! কিন্তু একি চেহাবার পরিবর্তন। বেলাকে চেনা দায়। প্রথমটা আশুবাবু তাকে কোন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে মনে করেছিলেন। বব্ করা চুল। নাইলনের শাড়ী, সেম্‌লেশকাট্ ব্লাউজ, দেহের তিনভাগ অনাবৃত, বুক পিঠ ও তলপেটের ওপর দিয়ে তার ধবধবে গায়ের রং দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটে পুরু লিপস্টিক, চোখে কাজল।

'আশুদা!' বলেই সিঁদুর মাখা লাল টকটকে ঠোঁটের ওপর ঈষৎ হাসির কম্পন তুললে বেলা। তারপর চোখ থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ঠিকরে দিয়ে বললে, 'তুমি কবে এলে এখানে? ও সরি! তার আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এঁর!' ব'লে তার পাশের সেই সুটপরা—অতি আধুনিক, স্মার্ট, সেই অল্প বয়সী তরুণ যুবকটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'ইনি আমার স্বামী মিঃ শিশিরকান্তি রায়। আর উনি আমার আশুদা! 'সরি,' তোমার টাইটেলটা কিন্তু ভুলে গেছি, কিছু মনে করো

না, উল্লেখ করতে পারলুম না ব'লে।' ব'লেই অকারণে যেন একটা হাসির গিটকিরী দিয়ে উঠলো। সে-হাসিতে খুশির চেয়ে বুঝি দশগুণ বেশী তারুণ্যের চপলতা প্রকাশ পেল।

ঘৃণায় অপমানে আশুবাবুর কান মাথা তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। তাঁর মনে হলো, বলেনি যে নামটুকুও যদি ওই সঙ্গে ভুলে যেতে, তা হ'লে কৃতকৃতার্থ হতাম! সত্যি তিনি কিছুতেই কল্পনায় আনতে পারছিলেন না যে এই সেই, বেলা। ব্রাহ্মণের বিধবা, যাকে একদিন তাঁর মনে হতো শুদ্ধচারিণী দেবী প্রতিমা!.

পাশের 'স্মার্ট ইয়ং ম্যানটি'র মুখের ওপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলে আশুবাবু যেন কি খুঁজতে চেষ্টা করছিলেন।

বেলা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝি অনুমান করতে পেরেছিল ওঁর মনের কথা!

নিমেষে মুখে একটা কৃত্রিম হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে, পিছনের দিকে দেহটাকে একটু হেলিয়ে, একেবারে সেই তরুণ যুবকটির কাঁধের আড়ালে মুখটা নিয়ে গিয়ে খপ্ ক'রে নিজের ঠোঁটের ওপর বেলা একটা আঙ্গুল চেপে ধরলে। অর্থাৎ ইসারায় সে এই কথাটাই আশুবাবুকে যেন জানাতে চাইলে তার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু প্রশ্ন না তুলে তিনি নীরব থাকেন!

তারপর দীর্ঘদিন পরে যেমন অতি পরিচিত কোন এক আপনজনকে বিদেশে দেখলে লোক আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে তেমনিভাবে প্রশ্ন করলে বেলা, 'আপনি এখানে কবে এসেছেন আশুদা?'

'তা দশ বারো দিন হলো! তোমরা কতদিন থাকবে?'

এর জবাব দিলে বেলার সেই তথাকথিত স্বামী। মুচকি হেসে পকেট থেকে সুগন্ধ রুমাল বার ক'রে মুখের ওপর বুলতে বুলতে বললে, 'সবটাই ওর ভাল লাগার ওপর নির্ভর করছে!'

'না, আশুদা। মিথ্যে কথা। ওর কথায় বিশ্বাস করো না। ওরি বরং সমুদ্র ভাল লাগে না। বলে বড্ড এক ঘেয়ে!' চোখটা বেঁকিয়ে, ঠোঁটটা কাঁপিয়ে, কেমন একটা কচি খুকীর মত ভঙ্গী করলে বেলা।

'তা কি করবো। সকলের কি সব জিনিস ভাল লাগে, বলুন ত?' যুবকটি এবার আশুবাবুর কাছ থেকে সমর্থনের আশায়, বুঝি তাঁর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

আশুবাবুর মুখে চোখে তখনো কেমন একটা বিস্ময় মেশানো সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব! এই এতটুকু ছোকরা, বেলার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট—সত্যি কি সে ওর স্বামী—না অন্য কিছু? বিশ্বজিতের সঙ্গে ত বিয়ে হয়েছিল। তবে কি বিশ্বজিতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে! কিংবা বিশ্বজিত মারা গিয়েছে।

খেতে খেতে এমনি নানা প্রশ্ন একসঙ্গে আশুবাবুর মনের মধ্যে যখন জট পাকাতে থাকে তখন বেলা কচি-খুকির মত সোহাগ-জড়িত স্বরে যুবকটির গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলে, 'এটা আমি খাবো না—তুমি তুলে নাও আমার পাত থেকে।' ব'লে যুবকটির তুলে নেবার অপেক্ষা না ক'রে নিজেই তার পাতের ওপর ওর উচ্ছিষ্ট আধখাওয়া কাটলেটটা ফেলে দিল।

যুবকটি তখন পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কাঁটায় সেটি বিদ্ধ ক'রে নিজের গালের মধ্যে ভরে দিয়ে যেন তার অপূর্ব আস্বাদ গ্রহণ করতে লাগল।

বেলার সম্বন্ধে আশুবাবুর মনে এতকাল যে সম্ভ্রমের ভাব ছিল—নিমেষে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে দিলে যেন বেলা নিজেই। আশুবাবু বসে বসে যেন দেখলেন চোখের সামনে বিসর্জন—সেই দেবী-প্রতিমার, যাকে একদিন অন্তরের দেউলে বসিয়ে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি

নিবেদন করেছিলেন! বিধবা, সংযত-বাক্, সুশিক্ষিতা, মধুর ভাষী, দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা মিশ্রিত নারীত্বের সেই অদ্ভুত প্রতিমার যেন নিরঞ্জন হলো সামনের ওই গর্জমান সমুদ্রের মধ্যে।

আশুবাবু কোন রকমে গলাধঃকরণ ক'রে উঠে পড়লেন। তারপর ঘরের মধ্যে না ঢুকে সামনের বারান্দায় এসে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বেলার কণ্ঠস্বর শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন।

'একি, তুমি এখানে এলে যে!'

'বারে, এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, একটু আলাপ করবো না বুঝি?'

বেলার মুখ থেকে এক ঝলক মদের গন্ধ আশুবাবুর নাকে এসে লাগল! এত অধঃপতন তা হ'লে হয়েছে বেলার?

তবু মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আশুবাবু বললেন, 'তোমার স্বামী কৈ—তিনি এলেন না!'

'তার এখন অর্ধেক রাত। একেবারে খাঁটি সাহেব। ন'টা বাজলে বিছানায় যাবেই যাবে!' ব'লে খিলখিল ক'রে অকারণে হেসে উঠে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। তারপর আবার কতকটা যেন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে নিজেই বললে, 'আমাকে দেখে তোমার খুব আশ্চর্য লাগছে না?'

'বলা-বাহুল্য!' আশুবাবু বললেন, 'তুমি কি সেই বেলা! সেই যখন কলেজে পড়তে। যখন তোমায় দেখেছিলাম বিধবা, শুচিশুভ্র দেবীমূর্তির মত!'

'এখন বুঝি দানবী বলে মনে হচ্ছে না?'

'যদি সত্যি কথা শুনলে রাগ না করো তা হ'লে বলবো, হাঁ। বাস্তবিক তোমার এই অধঃপতন—আমার কল্পনাতীত।'

'অধঃপতন! কি বললে, অধঃপতন! জীবনটাকে ভোগ করার নাম অধঃপতন! কেন, আমি যদি বিবাহিত স্বামীকে নিয়ে জীবন উপভোগ করি—তা হ'লেও ওই কথা বলবে? অধঃপতন তখনি হয়, যখন স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের প্রতি মেয়েরা আকৃষ্ট হয়। আমার স্বামী যা চায় আমাকে সেইভাবে চলতে হবেই। ও যদি আমাকে এইভাবে সাজিয়ে খুশি হয়, আমার কি তাতে বাধা দেওয়া উচিত? বলো, চুপ করে রইলে কেন?'

'স্বামী এই নিয়ে তোমার হলো ক'টা জিজ্ঞেস করতে পারি কি বেলা!' আশুবাবু তাঁর মনের রাগ আর সামলাতে পারলেন না।

'কি বললে, ক'টা স্বামী?' শিউরে উঠলো যেন সেই কথা শুনে বেলা। মদের নেশার আবেশে ঝিমিয়ে আসা চোখ ছু'টো আশুবাবুর মুখের ওপর তুলে ধরে আপন মনে এবার সে হেসে উঠলো। 'ক'টা স্বামী? 'লিগ্যাল' বলতে গেলে, একে ধরে তিন নম্বর।' ব'লে ঈষৎ রক্তাভ ও কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা ফুলো ফুলো চোখের দৃষ্টি যেন আশুবাবুর সমস্ত মুখটায় ছড়িয়ে দিলে।

আশুবাবু বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন ভেতরে ভেতরে। ওর মাতালের মত ভাবভঙ্গী যেন তাঁর সমস্ত রুচিকে বিদ্রূপ করছিল। মনেব রাগ সামলাতে না পেরে, তাই তিনি বলে ফেললেন, 'লিগ্যাল ছাড়াও কি তা হ'লে আরো কিছু…'

'নিশ্চয়ই। নারীত্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ত সেখানে! এত লেখাপড়া শিখে এ কথাটা আবার প্রশ্ন করছো!'

'সত্যি বলছি, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি বেলা!'

'ননসেন্স্! এর মধ্যে বুঝতে না পারার কি আছে! লিগ্যালের বিপরীত শব্দটা কি?' ব'লে মাতালের হাসি হেসে উঠলো।

'তার মানে তুমি বলতে চাও বিয়ে ছাড়াও আরো—।'

'অনেক-অনেক', তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ নাম্বারলেশ্ !'

'থাক থাক, ওসব নোংরা কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি ঘরে যাও, তোমার স্বামী হয়তো এখনি খুঁজতে আসবেন। তাছাড়া রাতও হলো অনেক।'

'কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো আশুদা। আর হয়তো জীবনে কোনদিন এ সুযোগ আসবেই না। তাই একটু গল্প করতে এলুম। হাজার হোক তুমি আমার পুরনো ক্লাশফ্রেণ্ড।'

আশুবাবু সহসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, বিশ্বজিতের সঙ্গে তোমার শেষ পর্যন্ত কি হলো !'

'কি আবার হবে ! ডিভোর্স। আমরা যে বাড়ীতে ভাড়া ছিলুম, সেই বাড়ীর ওপর তলায় যাঁরা থাকতেন তাদের একটা মেয়ে ক্লাশ টেন-এ পড়তো, তাকে নিয়ে একদিন উধাও হলো !'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আশুবাবু বললেন, 'গোড়াতেই তোমায় আমি সতর্ক ক'রে দিয়েছিলুম ওর সম্বন্ধে। তখন তুমি ত আমার কথা বিশ্বাস করো নি ?'

'প্লিজ্ ওকথা বলো না আশুদা। বিশ্বাস আমি করেছিলুম, কিন্তু তবু পারি নি ওর আকর্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। থাক থাক —সে সব অতীতের কথা। পুরনো কাশুন্দী ঘেঁটে এখন আর কোন লাভ নেই।' ব'লেই হঠাৎ এক ঝলক হাসি টেনে বলতে শুরু করলে, 'ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সে যদি ওইভাবে পালিয়ে না যেতো, তা হ'লে একে হয়তো আমি পেতুম না ! জানো, খুব বড়লোকের ছেলে এ। বিরাট মোটরের ব্যবসার একমাত্র মালিক। হঠাৎ বাপ মরে যাওয়াতে একেবারে সর্বে-সর্বা হয়েছে। কলকাতায় পাঁচ খানা ভাড়া বাড়ী। এর ওপর আছে কুড়িখানা ট্যাক্সির দৈনিক ইন্‌কাম !

ভাল করি নি একে বিয়ে ক'রে? বলো, চুপ ক'রে রইলে কেন?'

আশুবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা এর সন্ধান পেলে কোথায়?'

'একটু যদি অহঙ্কার করি ত আশা করি ক্ষমা করবে। আমাকে কোন পুরুষের সন্ধান কোনদিন করতে হয় নি, তারা আপনি এসে জালে জড়িয়েছে।'

আশুবাবু বললেন, 'বিশ্বজিতের ব্যাপারটা বোধহয় জানে না এ?'

'হাঁ, জানে। শুধু জানে নয়, তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে যে আমার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসতো রোজ। তারপর মোটরে ক'রে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে নিজেই একদিন প্রস্তাব করে বিবাহের।'

'বলো কি!' আশুবাবুর কণ্ঠে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে খিলখিল ক'রে হেসে ফেললে বেলা। বললে, 'এটুকু ক্রেডিট্ আছে আমার। তা ছাড়া তোমার নিজের 'কেস'টা দিয়েই ত বুঝতে পারো!'

'দেখো বেলা, আমায় ভুল বুঝো না। সত্যি বলছি, তোমার সেই পবিত্র দেবীমূর্তি আমায় মুগ্ধ করেছিল। সম্মোহিত করেছিল। তার আগে তোমার মত মেয়ে আমি কখনো চোখে দেখি নি!'

এবার এক বিচিত্র ধরনের হাসি হেসে গড়িয়ে পড়লো বেলা একেবারে আশুবাবুর গায়ের ওপর। 'কি বললে, দেবীমূর্তি? সত্যি সত্যি কি দেবীমূর্তির মত তখন আমায় দেখাতো! সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে আগে কি জানো? তুমি দেখলে দেবীমূর্তি আমার মধ্যে—অথচ বিশ্বজিৎ সে-ভুল করলে না। সে দেখলে অন্য এক মূর্তি!'

বেলা চুপ করতে না করতেই আশুবাবু অধৈর্য হয়ে উঠলেন। 'তবু আমি শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে একটা কথা। সত্যি ক'রে বলো আমি কি ভুল করেছিলুম সেদিন, তোমায় দেবীর আসনে বসিয়ে? তুমি কি তখন মিথ্যা অভিনয় করেছিলে আমার সঙ্গে?'

থর থর ক'রে কি যেন কাঁপতে থাকে আশুবাবুর গলার মধ্যে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত তাঁর চোখ মুখের ভাব।

সেদিকে তাকিয়ে বেলা বুঝি ভাবছিল কি উত্তর দেবে! সমুদ্র তেমনি একঘেয়ে গর্জন ক'রে চলেছে। কিন্তু বেলার কানে তা যেন কার বুকফাটা আর্তনাদের মত মনে হচ্ছিল।

'বলো, চুপ ক'রে থেকো না। তুমি যদি জানতে যে তোমার মুখের এই একটি কথার ওপর আমার জীবনের কতখানি নির্ভর করছে তা হ'লে তুমি কিছুতেই এমনভাবে নীরব থাকতে পারতে না, বেলা! আমি জানি তোমার অন্তর পাষাণ নয়!'

ওই শেষ কথাটা আশুবাবুর মুখ থেকে নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো বেলা শুধু একবার। তার চিন্তার জালকে নিমেষে যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। সমুদ্রের বুকে যে কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার তখন শিউরে শিউরে উঠছিল, মুখটা চট ক'রে সেদিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, 'থাক, সেকথা তুমি আর জানতে চেয়ো না আশুদা। অন্তত তুমি তা শুনলে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। বলতে বলতে বুকের মধ্যে কি যেন একটা জোর ক'রে দমন ক'রে নিলে বেলা, তারপর সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে আশুবাবুর চোখের ওপর আলতোভাবে নিজের দু'টি চোখ রাখতে রাখতে শুধালে, 'যদি একজনের মনে কোনদিন দেবীর আসন লাভ ক'রে থাকি, তাকে বিসর্জন দিতে বলো না আশুদা, বরং সেই স্মৃতিটুকু চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করবো।'

ব'লেই সহসা উঠে দাঁড়াল বেলা। তার সব নেশা যেন মুহূর্তে কোথায় ছুটে গেল। আশুবাবুর চোখের সামনে সে রূপান্তরিত হ'ল এক নতুন মানুষে! তিনি নির্বাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

বেলাও যেন স্বপ্নাভিভূতের মত নিঃশব্দে তার সামনে দিয়ে পা পা ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল তার নিজের কামরার দিকে। অল্প কিছু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। এবং এমন ভাবে ফিরে এলো যেন কি একটা জরুরী কথা বলা হয় নি।

আশুবাবুর সেই বিহ্বল ভাবটা বুঝি তখনো কাটে নি। বাইরের অন্ধকার সমুদ্রে বেশী গর্জন না তাঁর অন্তরের মধ্যে বেশী—বুঝি উৎকর্ণ হয়ে তাই শুনছিলেন।

সহসা বেলার কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলেন। মানুষকে কোনো একটা বিশেষ ঘটনা দিয়ে বিচার করতে যেয়ো না আশুদা। তা হ'লে শুধু ভুল নয়, অবিচার করবে তার ওপর। মনেরেখো, মানুষের জীবনটা একটা উপন্যাসের মত। তার ভূমিকা আছে। পূর্বাপর পরিচ্ছেদের একটা সঙ্গতি আছে। অথচ সে গুলোকে ছেড়ে শুধু তার মধ্যে থেকে মক্ষিকাবৃত্তির দ্বারা বিশেষ কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত ক'রে দেখালে যেমন উপন্যাসের সমালোচনা করা হয় না—এও তেমনি।'

ব'লেই ছুটে নিজের ঘরে গিযে ঢুকলো। নিজের মুখ যেন আর দেখাতে চায় না 'আশুবাবুর কাছে! যেন এমন একটা গুরুতর অপরাধ সে ক'রে গেছে যার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।'

আশুবাবুও তার পিছনে উঠে না গিয়ে তাকে না ডেকে তেমনি ভাবেই চুপচাপ বসে থাকেন। বুঝি বেলার ওই কথাগুলোর মধ্যে আসল কি ইঙ্গিত ছিল তার চিন্তায় মগ্ন।

হোটেলের কামরায় ঢুকে দরজাটা আগে বন্ধ ক'রে দিলে বেলা। কি জানি, আশুদা যদি হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়। তার বুকের মধ্যেটা অপরাধীর মত ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। ভাগ্যিস তরুণ জেগে নেই। তা হ'লে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো ধরে ফেলতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সে ঘুমচ্ছে। বালিশে মাথা ছিল না তরুণের।

বিছানার এক কোণে মুখটা গুঁজড়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। মদের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল তার। সে তা জানে। আরো জানতো, যে সে ইচ্ছা ক'রেই আজ তাকে নিষেধ করে নি। তাকে বেশী খেতে দেখে ও তার হাত থেকে 'পেগ্'টা কেড়ে নিতে যায় নি—'প্লিজ্' 'নো মোর' ব'লে। হাঁ, ইচ্ছে ক'রেই সে আজ তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল মদ্য পানে। তাড়াতাড়ি সে ঘুমিয়ে না পড়লে, যে আশুবাবুর কাছে যাওয়া হবে না, তাই।

যা হোক্ নিজের ঘরে পালিয়ে এসে সে যেন বেঁচেছে।

আশুবাবু যেন আজ হঠাৎ তার স্মৃতির সল্‌তেটা উস্কে দিয়ে এতকাল পরে মনের অন্ধ গহনে যে-কথা লুকানো ছিল, সব যেন প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

'স্লিপিং গাউনটা' পরে বিছনায় গিয়ে শুয়ে আবার উঠে পড়ে বেলা। তাড়াতাড়ি চোখে ঘুম আনবার জন্যে আলমারী থেকে বোতলটা বার ক'রে এক 'পেগ্' গলায় ঢেলে আবার গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলে। হাঁ, ভুলতে হবে যা কিছু পুরনো, বাসি, যা কিছু অতীত, সবকে! পুরনো কোন কিছুকেই সে মনে ঠাঁই আর দেবে না।

কিন্তু যত মনে করে ভাববে না, তত যেন সেই পুরনো কথাই মনের বদ্ধ কপাটে এসে মাথা ঠুকতে থাকে। ঠুকতে ঠুকতে শেষে এক-সময় দরজা ভেঙ্গে ফেলে একেবারে এসে ঢোকে তার ঘরে ভেতর তার একেবারে চোখের সামনে। দু'টো হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ চেপে ধরে শুয়ে থাকে বেলা। অন্ধকার। চারিদিকে অন্ধকার। তবু পারে না—সেই মূর্তিটাকে ভুলতে। হাঁ, এ সেই পরিতোষ! অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট দেখে, উজ্জল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে হাসছে! চিনতে ভুল হয় না সে হাসি। হবে কি ক'রে? সেই ত প্রথম পুরুষ এসেছিল তার জীবনে। তার জীবনের প্রথম অতীতের, তখন সে ক্লাশ

নাইন-এ পড়ছে। মামাদের সঙ্গে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিল হাজারিবাগে। বেলারা যে বাংলোতে উঠেছিল, তার সামনেই ছিল মিত্তিরদের বিরাট বাগান বাড়িখানা। ফুলে ফলে ঝলমল করতো দিনরাত তার চোখের ওপর। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাগানে ঢুকে চুপি চুপি মালির চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন ফুল চুরি করেছে বেলা। লাফিয়ে লাফিয়ে পেয়ারার ডাল থেকে ডাঁশা পেয়ারা পেড়ে নুন দিয়ে মামীর সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে চিবিয়েছে! তারপর হঠাৎ একদিন মিত্তির বাড়ির গৃহিণী এলেন বেড়াতে। বেলারাও গেল ওদের বাড়িতে সে-আসা ফেরৎ দিতে।

এমনি ক'রে দুই বাড়িতে আনাগোনা বেড়েই চলে। ওরা প্রথমে এসেছিল অল্প লোক। ক্রমশঃ দফায় দফায় ওদের বাড়ীটায় লোক বাড়তে থাকে। প্রত্যেক শনিবার কেউ না কেউ আসে কলকাতা থেকে। তারপর দিনরাত্রি হৈ-হল্লা, তাস পাশা, গান। দল বেঁধে এখানে ওখানে বেড়াতে বেরোনো, হাটে যাওয়া ইত্যাদি।

ওদের সঙ্গে কোন কোনদিন বেলারাও যেতো একই পথে বেড়াতে। দলটা তখন খুব বড় হতো! কখনো বরাকর নদীর দিকে, কখনো শালবনে, কখনো বা স্টেশনের পাশে, হাট করতে যেতো দল বেঁধে।

পুজোর ছুটিতে ওরা গিয়েছিল ওখানে হাওয়া বদলাতে। বেলার শরীর খারাপ বলে তার মামী-ই যেচে তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেলার মামাদের অবস্থা তখন খুব ভাল যাচ্ছিল। যুদ্ধের বাজারে কি যেন ব্যবসা করতেন, তাতে ধুলো-মুঠি ধরলে না কি সোনা-মুঠি হয়ে যেতো। যাকে বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। হঠাৎ সেই রকম বড়-লোক হয়ে গেলেন বেলার মামা রাতারাতি। ফাস্ট ক্লাশ রিজার্ভ ক'রে

দেশ-বিদেশে হাওয়া খেতে যেমন যেতেন, প্রচুর খরচাও তেমনি করতেন।

পরিতোষ যুবক। ছিপছিপে লম্বা একহারা চেহারা। ময়লা রং। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কথা বলতে গেলে আগে ঝকঝকে সুন্দর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। সামনের দাঁতগুলো বোধহয় একটু বড়ই ছিল। তবু ভাল লাগতো তাকে দেখতে বেলার! ওর সঙ্গে আলাপ হাওয়ার পর আর কাঁচা পেয়ারা চুরি করতে হতো না বেলাকে। পরিতোষ ওদের বাগান থেকে এক সময় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতো এদের বাগানে। তারপর মামীর সঙ্গে বাগানে বেড়তে বেড়াতে সেই পেয়ারাগুলো যেন হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বেলা পুলকিত হয়ে উঠতো। এবং বলতো, 'কোথা থেকে পেয়ারা এখানে এলো, মামী?'

বেলা জানতো, এ কাজ কার! তবু মামীর মনটা নেড়ে দেখবার জন্যে ওইরকম ন্যাকার মত প্রশ্ন করতো। পরিতোষের যে আকর্ষণ তার প্রতি, এটা কতখানি অনুমান করতে তিনি পেরেছেন—আসলে সেই খবরটাই সে জানতে চাইতো!

মামী ছিলেন পল্লীগ্রামের মেয়ে। হঠাৎ বড়লোক হ'লেও নিজের স্বভাবটাকে চেপে রাখতে শেখেন নি। একটু রস দিয়ে তাই উদ্ভিন্ন-যৌবনা ভাগ্নীর কথার জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'ভূতে এনেছে। নইলে এমন ভাল ভাল পেয়ারা এখানে আসবে কোথা থেকে তোর জন্যে বল?'

'ভূত!' শুনেই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে বেলার মুখ। কণ্ঠে কাঁপন জাগিয়ে বলে, 'কি বলছো মামী, ভূত?'

মুচকী হেসে বেলার গালে একটা ঠোনা মেরে তিনি বলেন, 'ন্যেকী। যেন কিছু বোঝেন না। হ্যাঁ লো হ্যাঁ, ভূত আছে, তবে এ বাড়িতে নয়, ওই সামনের বাড়িতে।'

আতঙ্কে চোখ দু'টো বিস্তারিত ক'রে বেলা শুধায়, 'তাই না কি, তুমি আরো দেখেছো তাকে ?'

'হাঁ। ইয়া কালো রং, লম্বা জোয়ান ছোকরা ভূত, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সোমত্ত মেয়ে দেখলেই নজর দেয়।'

'ধ্যেৎ !' ব'লে লজ্জায় মুখটা তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হেসে ফেললে বেলা !

কাঁচা পয়সা মামা মামীর হাতে অঢেল। কিন্তু খরচ করতে না পারলে বড় মানুষী দেখানো যায় কি ক'রে ? তাই যখন তখন বিলাপ করতেন তিনি, এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গা এই হাজারীবাগ রোড। না আছে কোন সিনেমা, না দোকান বাজার, না কোন গাড়ি ঘোড়া। পদব্রজে আর কত বেড়ানো যায়। বিশেষ পয়সা হয়েছে ব'লে মামী এখন এক-পা হাঁটতে নারাজ। কিছুদূর যান আর মামাকে অভিসম্পাত দেন, এমন পোড়া-কপালে জায়গায় মানুষ আসে ? তুমি আর খুঁজে পেলে না চেঞ্জ-এর জায়গা !'

সত্যি জলহাওয়াটা ওখানকার আসাধারণ ভাল—মামীর হজমের যা কিছু গণ্ডগোল সব দশদিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যত কিছু অসুবিধাই থাক, তবু পুরো একটা মাস ওখানে কাটাবেন ব'লেই স্থির করেছিলেন মামা !

মিত্তির বাড়িতে সব সময়ই হৈ হুল্লোড। তাই ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করতেন তিনি মামীর মনটাকে খুশি রাখবার জন্যে। কোনদিন ওঁদের সব চায়ের নেমতন্ন করতেন নিজের বাংলোতে। কোনদিন বা দু'তিন খানা গরুর গাড়ি ভাড়া ক'রে শালবনের ভেতর দিয়ে উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে বেড়াতে যেতেন দলবদ্ধ হয়ে। গাড়ি ভাড়াটা সবই বেলার মামা পকেট থেকে দিতেন।

মিত্তিররাও মধ্যে মধ্যে ওদের নেমতন্ন করে খাইয়ে শোধ দিতেন। কিন্তু ওর মামার সঙ্গে পেরে উঠতেন না। তারাও ছিল বড়-লোক। তবে বনেদী বড়লোক। বেলার মামার মত পয়সা দেখা-বার জন্যে ছটফট করতেন না। কোন কোন দিন হঠাৎ গোটা চারেক মুরগী কিনে তিনি মিত্তির বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। আবার কলকাতা থেকে পার্শ্বেল ক'রে যে-সব অসময়ের কপি কড়াইশুঁটি, আপেল, বেদানা প্রভৃতি আনাতেন, তারও কিছু কিছু ও বাড়িতে বেলার মারফৎ চালান করতেন। বেলার লজ্জা করতো ওই সব হাতে ক'রে নিয়ে যেতে? কিন্তু মামী সস্নেহ তিরস্কার ক'রে বলতেন, 'আহা মেয়ের যাবার ইচ্ছে ষোল আনা মুখে বললে পাছে আমরা কিছু মনে করি তাই। জানি গো জানি, আমাদেরও এক কালে বয়েস ছিল।'

'যাও তুমি বড় অসভ্য।' ব'লে মনের আনন্দ চাপতে চাপতে একেবারে সুবোধ বালকের মত মামা মামীর আজ্ঞা পালন করতে ছুটতো বেলা। তারপর? সেই একদিনের কথাটা স্মরণ করতে গিয়ে বেলার বুকের মধ্যেটা ঢিপ ঢিপ ক'রে ওঠে এখনো। হাঁ, হঠাৎ একদিন স্টেশনের কাছ থেকে কোন একটা মাড়োয়ারীর ট্রাক ভাড়া ক'রে এনে মামা বললেন, 'চলো শিগ্‌গির, গোছ-গাছ ক'রে নাও, পরেশনাথ পাহাড়টা দেখতে যাবো এখনি। খবর দাও, মিত্তিরদের। আজ ওখানে গিয়ে আমরা সব 'ফিস্ট্' করবো।'

মামা বললেন, 'যা যা বেলা, শিগ্‌গির ওদের তৈরী হতে বলগে যা।'

বেলা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো, 'আমি বলতে যেতে পারবো না!'

'আচ্ছা, তুই নিজে তৈরী হয়ে নে ততক্ষণ। আমিই যাচ্ছি ওদের বলতে।'

ট্রাক ভর্তি ক'রে ওরা সবাই চললো পরেশনাথ পাহাড়ে। মিত্তির-দের বড় দল—ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি, গিন্নী, যুবক-যুবতী অনেকগুলি। ওরা হৈ-চৈ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই সঙ্গে হারমোনিয়ম, গীটার, তবলা, তাস পাশা আগে নিলে। বেলার মামাতো ভাই-বোন ছিল চারজন—সকলেই তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তারা বললে, 'খুব আনন্দ হবে আজ বেলাদি না?' সত্যি, আনন্দ পথ থেকেই শুরু হলো। যেতে যেতে ট্রাক থামিয়ে এখান থেকে মাংস, ওখান থেকে দৈ, আবার আর একজায়গা থেকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে তারা গাড়ী বোঝাই করছিলেন। এপক্ষে বেলার মামা আর ও পক্ষের পরিতোষ। পরিতোষকে কিছু বলামাত্র একেবারে লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তো।

পরিতোষের সঙ্গে মিত্তির বাড়ির কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না। ও ছিল ছেলেদের বাড়ির মাস্টার বা 'গার্জেন টিউটর'! ওদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে—খাওয়া-থাকার বিনিময়ে। এইটুকু মাত্র পরিচয়। বিনা খরচে পূজোর কিছুটা বিদেশে উপভোগ করতে গিয়েছিল।

পাহাড়ের ওপর উঠতে উঠতে সুন্দর একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে সেখানে তারা জিনিসপত্র নামালে, তারপর কোথায় কাঠ, কোথায় রাঁধবার জল, কোথায় কি পাওয়া যায়, খোঁজাখুঁজি করতে ছোটে পরিতোষ। বেলার ওপর ভার পড়লো কাঁচা শাল পাতা সংগ্রহ ক'রে এনে, জল দিয়ে ধুয়ে সকলকে জলখাবার পরিবেশন করার। শুকনো পাতা ও কাঠকুঠো এখান-ওখান থেকে যোগাড় ক'রে এনে সব আগে চায়ের জল চেপে গেল, মিত্তির বাড়ির সেই বড় এলু-মিনিয়মের কেটলিতে।

বেলার চেয়ে বয়সে অনেক বড় মিত্তির বাড়িতে দু'জন আইবুড়ো মেয়ে ছিল—তারা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

জলযোগের পাঠ সমাধা হ'লে, তখন আসল রান্নার উদ্যোগে সবাই উঠে পড়ে লাগল। ছেলে-মেয়েরা মহোৎসাহে কেউ মাংস বাছতে বসলো কেউ বা পিঁয়াজ ছাড়াতে। মিত্তির বাড়ির ঠাকুর ও বেলার মামার বাড়ীর রাঁধুনী কাঠ জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়ে দিলে। তখন ছোট ছোট দলে কোথাও গানের আসর, কোথাও তাস পাশা, কোথাও বা ছেলেদের লুডো খেলা। মিত্তির বাড়ির আইবুড়ো মেয়ে দু'টির একজন ধরলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আর একজন গীটার বাজিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'ফলো' করতে লাগল।

বেলা গান বাজনা দু'টোর কোনটাই জানতো না। তাই বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছিল, ওরা কত সুখি!

ওদিকে তাস খেলায় মেতে উঠেছেন বেলার মামা মামী, মিত্তির-গিন্নী ও কর্তার সঙ্গে। স্কুলে উঁচু ক্লাসে যারা পড়ে, সেই সব ছেলেমেয়েরা পাশা নিয়ে বসেছে একটু তফাতে, বিরাট একটা মহুয়া গাছের তলায়! উঁচু নীচু পাহাড়ের ঢিবি যেন সেই স্থানটাকে ঘিরে রেখেছিল। শাল, মহুয়া, কেঁদ, হরিতকী প্রভৃতি পাহাড়ী কত গাছের ঝোপ ঝাড় চারিদিকে।

মাংসের হাড়ীটা নামাতেই হুঁস হ'ল বেলার মামীর। এই যা! পাতা ত আনা হয় নি! এতগুলো লোক খাবে কিসে!

বেলা বলে, 'শাল পাতা গাছ থেকে তুলে আনবো মামী?'

'পারবি, তুই এত পাতা আনতে?' মামী তাসের পিঠ কুড়তে কুড়তে প্রশ্ন করলেন।

"বাবা পরিতোষ, তুমি একটু দেখ না কোথায় পাতা পাওয়া যায়, নইলে খাবে কিসে,' ব'লে মিত্তির-গিন্নী অনুরোধ করলেন পরিতোষকে।

পরিতোষ সঙ্গে সঙ্গে গানের আড্ডা ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মিত্তির-গিন্নী বললেন, 'যা ত মা—কোথা থেকে তখন পাতা এনেছিলি, ওকে দেখিয়ে দে।'

পেছনের একটা সরু 'পাকদণ্ডী' দিয়ে প্রথমে নেমে এলো বেলা, নিচের একটা বিরাট শালবনের মধ্যে! তার পিছু পিছু পরিতোষ আসছিল। হঠাৎ সে ব'লে উঠলো, 'বাবা তুমি একা এইখান থেকে পাতা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে? ভয় করে নি? এ যে নিবিড় বন!'

মুখে সাহস দেখিয়ে বেলা জবাব দিলে, 'ভয় কিসের?' ব'লেই তখনি পাতা ছিঁড়তে শুরু ক'রে দিলে।

'এসব জায়গায় ত বাঘ থাকে!' বলতে বলতে এগিয়ে যায় পরিতোষ তার কাছে।

"বাঘ আছে না কি এখানে সত্যি?' বেলার কণ্ঠে আতঙ্কের আভাস।

থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই ত সন্ধে হবার অনেক আগেই এ পাহাড় ছেড়ে সবাই চলে যায়। দেখছো না পাহাড়ের মধ্যে কি রকম সব বড় বড় গহ্বর—এই জায়গায় ত বাঘ লুকিয়ে থাকে।'

'ভয় দেখাচ্ছেন আমায়? চলুন তা হ'লে ওদিক পালাই!' ব'লে দ্রুত পদে বেলা পাতা তুলতে তুলতে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। চারা শাল গাছের বন চারিদিকে অসংখ্য হ'লেও, এক একটা বৃহদাকার বনস্পতি ডালপালা বিস্তার ক'রে যেন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মত। নিস্তব্ধ দুপুর। থেকে থেকে মাথার ওপর শন্ শন্ শব্দ ওঠে উঁচু গাছের ডালে ডালে। দু' চার পা যায় আর পিছন ফিরে ফিরে দেখে বেলা পরিতোষ কোথায়। কেমন যেন তার গা ছম ছম করে। শুকনো পাতার ওপর নিজের পদধ্বনি শুনে নিজেই থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ একসময় পিছন ফিরে দেখে, পরিতোষ

নেই। পরিতোষদা! পরিতোষদা! ব'লে ডাকতে ডাকতে এদিক ওদিক শালবনের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকে বেলা। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ ঘেমে ওঠে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে।

নির্জন একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল পরিতোষ, বেলাকে ভয় দেখাবার জন্যে। নিকটে বেলার পায়ের শব্দ পেয়েই সে 'কু' ব'লে ছোট একটি আওয়াজ মুখে তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেল।

শব্দটাকে অনুসরণ ক'রে যেই সেদিকে এগিয়ে গেল বেলা অমনি পেছন থেকে তার চোখ দুটো টিপে ধরলে পরিতোষ। তারপর তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললে, 'এর নাম তুমি সাহসী!'

পরিতোষের হাত দুটো চোখের ওপর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে তার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো বেলা। বললে, 'এখানে কি আপনি এসেছেন আমার সাহসের পরীক্ষা করতে?'

অকস্মাৎ বেলার কাঁধের ঠিক নীচের স্থানটা অর্থাৎ বাহুমূলের ওপরের দুটি অংশ দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে পরিতোষ বললে, 'এখনো ভয় গেল না, এত কাঁপছো কেন?' তার চোখে-মুখে যেন কি এক সর্বনাশা ক্ষুধা!

'আপনার মত এত সাহস আমার নেই তাই।' বলতে গিয়ে ওর গলা উঠলো কেঁপে। শিউরে উঠলো তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, আর যেন সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পায়ের নীচের সমস্ত মাটিটা বুঝি কাঁপতে থাকে, মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। চোখের সামনে সব কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে। প্রথম মদ খেলে যেমন নেশার ঘোর লাগে, তেমনি যেন তার হাত-পাগুলো টলতে থাকে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না বেলা। ছিন্নমূল লতার মত পরিতোষের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

তারপর ? তারপর, আর কিছু মনে নেই বেলার।
কালের স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেল কে খোঁজ রাখে।

বছরের পর বছর কেটে যায়।

বেলা ম্যাট্রিকটা পাশ করলে যে বছর সেই বছর ওর বাপের মৃত্যু হলো। ফলে লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হলো সে। ওর মা মেয়ের বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। কেবল ঘটক-ঘটকী নয়, যাকে পান তাকেই অনুরোধ করেন মেয়ের জন্যে একটা পাত্র দেখতে।

এমনি ক'রে আরো চারটে বছর যখন কেটে গেল তখন হঠাৎ একদিন খুব অবস্থাপন্ন ঘরে তার বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র প্রফেসর। বয়স একটু বেশী হয়েছিল, কারণ বিয়ে করবে না ব'লেই পাত্র এতদিন ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে ছিলেন। তারপর হঠাৎ কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে প্রজাপতির নির্বন্ধে একেবারে বেলার সঙ্গে মালা বদল ক'রে ফেললেন তা একমাত্র ঈশ্বর যিনি পুরুষের মনকে এমন দুজ্ঞেয় ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছাড়া বুঝি আর কেউ জানেন না।

পাত্রেরা তিন ভাই। বড়জনের বিয়ে আগেই হয়েছিল। মেজ এতদিন বিয়ে করেন নি বলেই ছোটভাইও বিয়ে করে নি। ও ছিল মেজ দাদার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। রাম লক্ষ্মণের মত এদের দুই ভাইয়ের ছিল ভাব। ছোট ভাই তখন হেড অফিস বোম্বাইতে চাকরী করছে, তখন হঠাৎ এই বিয়েটা হয়ে গেল মাত্র তিন দিনের কথাবার্তায়।

ছোট ভাই বিয়ের দিনে উপস্থিত হ'তে পারলে না অফিসে ছুটি পায় নি ব'লে, একেবারে ফুলশয্যার দিন বিকেলের বিমানে কলকাতায় এসে হাজির হলো।

বেলার শ্বাশুড়ী ছোট ছেলেকে বিশ্রাম করতে দিলেন না। একেবারে তার ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'আগে দেখবি চল। কি সুন্দর এনেছি তোর বৌদি।'

সামনে বজ্রপাত হ'লেও বোধহয় মানুষ এতো বিস্মিত হয় না। 'এ্যাঁ, এ যে সেই পরিতোষ।'

'ওগো বৌমা, ঘাড় উঁচু করো। লজ্জা কি! এ তোমার লক্ষ্মণ দেওর। আমার মহীতোষের সঙ্গে একেবারে পিঠোপিঠি।'

বেলা ঘাড়টা একবার উঁচু ক'রেই আবার যখন নামিয়ে নিলো তখন বেলার শ্বাশুড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকি, এমনি চলে যাচ্ছিস যে! নমস্কার কর বৌদিকে আগে!'

বেলা মুখে কথা বলতে পারে নি। কিন্তু হাত নেড়ে দূরে সরে গিয়েছিল পাছে সত্যি সত্যি নমস্কার করতে আসে পরিতোষ।

সেদিন বাঁচিয়েছিল পরিতোষ তাকে সেই ভীষণ লজ্জা থেকে। আর শুধু তাই নয় পরদিন ভোরের বিমানযোগে সে আবার ফিরে গিয়েছিল বোম্বাই।

মাকে-বাবাকে ও দাদাদের বলেছিল, 'বড় কড়া সাহেব। ছুটি কিছুতেই দিতে চায় না। অনেক কষ্টে একটা দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। শিগ্‌গির আবার আসবো—তোমরা চিন্তা করো না।'

বলাবাহুল্য, এই বলে সে এড়িয়ে গিয়েছিল বেলাকে। তারপর থেকে দুটো বছরের মধ্যে সে কলকাতায় ফেরে নি। মা বাবা দাদা, বৌদি প্রভৃতি কত আসবার জন্যে চিঠি লিখেছেন—কিন্তু তার সেই এক জবাব। 'বড় কড়া সাহেবে, ছুটি নেই। তাছাড়া কাজের ভীষণ চাপ!'

কিন্তু সহসা বেলার স্বামী কলেজ থেকে ফেরার পথে বাস-এ ধাক্কা

খেয়ে যেদিন হাসপাতালে মারা গেলেন সেদিন আর না এসে পারলো না পরিতোষ।

এবার মা, বাবা, বড় ভাই সবাই তাকে চেপে ধরলে কলকাতায় বদলী হয়ে আসবার জন্যে। প্রথমটা সে তেমনি দৃঢ় ও অনমনীয় কণ্ঠে বলেছিল, 'তা সম্ভব হবে না।'

শ্বাশুড়ীর চোখের জল সহ্য করতে না পেরে বেলা এবার নিজেই এগিয়ে এসেছিল তার সামনে। মাথার ওপর ঈষৎ ঘোমটাটা টেনে দিয়ে বলেছিল, 'আর সবাই যেন পর কিন্তু মা তাঁর জন্যেও কি এতটুকু তোমার মন কেমন করে না ঠাকুরপো! যে ক'দিন উনি আছেন, ওঁর কাছে থাকলে কি খুব অন্যায় হবে!'

এর পরের মাসেই পরিতোষ বদলী হয়ে সত্যি সত্যি কলকাতায় চলে এলো।

গভীর রাত। হোটেলের কক্ষে কক্ষে মৃত্যুর নীরবতা। বিলিতী হোটেলে কোথাও টু শব্দটি নেই। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু বেলার চোখে ঘুম নেই, অন্ধকারের ওপর অন্ধকার জমাট বাঁধতে থাকে তার চারপাশে। চোখ দু'টো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে। তবু ঘুম আসে না। বাইরের সমুদ্রগর্জন ঘরের ভেতর থেকে মনে হয় যেন কি এক মহাপ্রলয় চলেছে প্রকৃতিতে।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের মধ্যে শুরু হয় আর এক মহাতাণ্ডব!

সেদিনের কথাটা আজো স্পষ্ট তার কানে বাজে। বেলার মনে আছে সব! সে ত ভোলবার নয়। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে বাধাটা আসে শ্বশুরবাড়ীর তরফ থেকে। কিন্তু বেলার জীবনে হাওয়াটা বয়েছিল উল্টো দিক থেকে। অর্থাৎ শ্বশুর, শ্বাশুড়ী বড়জা— সবাই বলেন তাকে আবার বিয়ে করতে।

বেলা ভেবেই পায় না। এসব কথার অর্থ কি! শাশুড়ী তাকে —থান শাড়ী পরতে দেন নি, হাতের চুড়ি খুলতে দেন নি, হবিষ্যির বদলে নিজে নিরামিষ রান্না ক'রে খাওয়াতে গিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাকে বলতেন, 'যে গেছে, সে আর ফিরে আসবে না জানি কিন্তু তোমাকে যেমন সে দিয়ে গেছে আমাদের হাতে, তুমি তেমনি থাকো মা ঘর জোড়া ক'রে! তোমায় দেখে যেন না মনে হয় মহী আমাদের ফাঁকী দিয়ে পালিয়ে গেছে।'

বেলা তাই হঠাৎ তাঁর মুখে ওই কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল। বুঝতেই পারে নি যে তু'টো বছর কাটে নি এরি মধ্যে এমন কি কোথায় ঘটে গেল, যার জন্যে সবাই তাকে বিয়ে করবার সতুপদেশ দিচ্ছেন। এবং সেই শাশুড়ীই মুখ ফুটে বলছেন, 'না মা আমাদের পাপ হবে, তোমাকে এই ভাবে ঘরে ধরে রাখলে।'

শ্বশুরও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই কথাটাকেই নানা অলঙ্কার দিয়ে শুনিয়ে দেন। 'নিজের মেয়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে ভাল পাত্র দেখে তোমার আবার বিয়ে দেবো মা, তুমি শুধু মনটা স্থির করো আগে।'

সেদিন বেলা এর জবাবে কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু কেঁদেছিল। শাশুড়ী চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ছি মা কেঁদো না। তোমার বয়স এমন কি হয়েছে, আস্ত জীবন ত পড়ে রয়েছে তোমার সামনে মা!'

ভিজে চোখ শাশুড়ীর মুখের ওপর স্থাপন ক'রে বেলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি কোন অপরাধ করেছি মা—

'অপরাধ তোমার কি মা? বরং অপরাধ আমাদের। ঘরে ঘরে যখন বাল্যবিধবাদের বিয়ে হচ্ছে এবং সমাজ সেটাকে মেনে নিয়েছে তখন এইভাবে তোমাকে যদি আমরা আটকে রাখি ত ভগবানের কাছে যে অপরাধী হব মা আমরা। বিশেষ ক'রে আজকাল যেখানে

পঁচিশ, তিরিশ বছরে মেয়েদের প্রথম বিয়ে হচ্ছে! তার তুলনায় তুমি ত অনেক ছেলেমানুষ!'

তখনো বেলার কাছে সব যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে!

আসল কথাটা কিন্তু একদিন শুনলে বেলা বড়জায়ের মুখে। তার চুল বেঁধে দিতে বসেছিলেন তিনি। মোটা চিরুনীটা টেনে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখ্ ভাই। তোর নিজের মন ত নিজের কাছে, নইলে পরে সারা জীবন পস্তাতে হবে! শ্বশুর ঠাকুর যখন নিজেই খরচা-পত্তর করতে রাজী, তখন এ সুযোগ নষ্ট করা, আমার মতে উচিত নয়!'

দাঁত দিয়ে চুলের একটা দড়ি কামড়ে ধরে ছিল বেলা। সেটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে সে বললে, 'ছি দিদি। তুমি কি ক'রে এ কথা মুখে উচ্চারণ করছো?'

'কেন, এ ত দোষের নয়। আজকাল এমন কত হচ্ছে শিক্ষিত বড় লোকদের ঘরে। কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে সবাই আবার সিঁদুর, আলতা পরছে, মাছ খাচ্ছে, ঘরকন্না করছে। সাধ-আহ্লাদ যার কিছুই মিটলো না, কেন সে…

বড়জায়ের মুখের কথাটা থামিয়ে দিয়ে বেলা এইভাবে উত্তর দিয়েছিল, 'ভগবান যদি সাধ-আহ্লাদ আমার কপালে লিখতেন, তা হলে এমন হবেই বা কেন—দু'টো বছরও যে কাটলো না দিদি?' ব'লে চুপ করতে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে। তারপর আঁচল দিয়ে যত চোখ মোছে, জল আর থামে না।

দু'জনের মধ্যে যেন একটা কঠিন নীরবতা নেমে এলো। নিঃশব্দে লম্বা বেণীটাকে বেলার পিঠের ওপর বারকতক ঠুকে তারপর মাথার ওপর গোলাকৃতি ক'রে তাতে কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে বড়জা প্রথম সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। 'তুই থাকতে পারবি জানি কিন্তু মুখপোড়া

পুরুষ জাত কি তোকে ঠিক থাকতে দেবে! এই রূপ, এই যৌবনকে কি ক'রে একা পাহারা দিবি? তাই এখন থেকে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে ফেললে পরে আর ভয়ের কারণ থাকবে না।' বলতে বলতে সর্বশেষ যে কাঁটাটা দাঁতে কামড়ে রেখেছিলেন, সেটা বেলার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া ভাই ঠাকুরপোর চোখ মুখের চেহারা আমার ভাল লাগে না, সত্যি বলছি তোকে। শেষকালে কি একটা কিছু কেলেঙ্কারী ক'রে বসবি!'

চমকে উঠলো বেলা! 'ছি দিদি! এ কথাটা তুমি মুখে আনলে কি ক'রে?' সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ উপছে পড়লো কান্নায়!

'আ-ম-লো—তা এতে কাঁদবার কি হয়েছে! আমি কি তোর সঙ্গে বদনাম দিয়েছি!'

'বদনাম আর দিতে কি বাকী রাখলে? কোনদিন কি আমার মধ্যে তোমরা কোন বে-চাল কিছু দেখেছো? বরং যতক্ষণ ঠাকুরপো ঘরে থাকে আমি ওদিক মাড়াই না পর্যন্ত।' ব'লে আঁচলের কোণে বারবার চোখ মুছতে লাগল।

'আমি কি তা জানি না, যে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছিস?' ব'লে গলাটা একটু নামিয়ে বড়জা বললেন, 'শুধু আমি নয়, মাও দেখেছেন দু-তিন দিন। অনেক রাত্রে না কি ঠাকুরপো এসে দাঁড়িয়ে থাকেন তোর জানলার কাছে।'

'মিথ্যে কথা!' বলার সঙ্গে সঙ্গে বেলার বুকের ভেতরের বিশেষ একটা নিভৃত অংশ যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। পুষ্করিণীর স্তব্ধ জলের ওপর একটা ঢিল ফেললে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃত্তাকারে ঢেউগুলো ঘুরতে ঘুরতে ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে যেমন এক সময় মিলিয়ে যায় কিনারায় তেমনিভাবে পরিতোষের সঙ্গে সেই দুর্ণামটা কান থেকে ধীরে ধীরে যেন বেলার সমস্ত সত্তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

সহসা ঠাকুরপোর চোখের সেই গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কথা স্মরণ হওয়া মাত্র তার সর্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু, পরক্ষণেই আবার সে নিজের মনে তোলা-পাড়া করতে থাকে, ঠাকুরপো ত তার সঙ্গে গায়ে পড়ে কোন কথা বলতে আসে নি কোনদিন, বরং দূরে দূরেই থাকে। অবশ্য মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কোন কোন দিন যে তার দৃষ্টির সঙ্গে পরিতোষের দৃষ্টির সংঘর্ষ হয় নি তা নয়। কিন্তু সে দৈবাৎ—হয়ত বা উভয়ের অজ্ঞাতে! সে কথা ত আর কেউ জানে না। মনের গোপনতম প্রদেশে সঙ্গে সঙ্গে তাকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলেছে বেলা যাতে পরিতোষ পর্যন্ত না বুঝতে পারে কিছু। বেশ মনে আছে, কয়েকদিন তার দিকে ওইভাবে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় তাকাতে দেখে, একবার বেলা চুপি চুপি পরিতোষের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। শাশুড়ী, বড়জা প্রভৃতি তখন নীচে পরিতোষের অপিসের রান্নায় ব্যস্ত।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে ব্রাস দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল পরিতোষ এমন সময় দেওয়ালের আয়নায় বেলার প্রতিচ্ছবি দেখে বুঝি তার হাত ক্ষণকালের জন্যে থেমে গিয়েছিল। আর তা লক্ষ্য ক'রে বেলার কণ্ঠ কঠিন হয়ে উঠেছিল, 'আজ একটা কথা তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার কাছে।'

'বলো!' ব'লেই আস্তে আস্তে তার মুখের ওপর সদ্য স্নানকরা ভিজে ভিজে চোখ দু'টো রেখে পরিতোষ নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ায়।

দৃঢ়তার সঙ্গে কণ্ঠে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্য এনে বেলা বলে, 'আর কোনদিন তুমি এইভাবে অসভ্যের মত আমার দিকে তাকাতে পারবে না। যদি অন্য কারুর চোখে পড়ে, ত কি ভাববে! তোমাদের বাড়িতে আমি সম্মানের সঙ্গে বাস করি, তা কি তুমি চাও না? ভুলে যেয়ো না তোমার দাদা তোমাকে কি চোখে দেখতেন!'

'দেখো, দাদাকে তুমি দেখেছো বোধহয় দু'টো বছর। আর আমি তাঁকে জানি পঁয়তিরিশ বছরের বেশী। কাজেই তাঁর পরিচয় আমার কাছে তোমার দিতে আসা ধৃষ্টতা বলে মনে করি।'

জবাব নয়, যেন বেত দিয়ে চাবকে দিলে পরিতোষ বেলাকে।

নীরবে ঠোঁটের প্রান্তভাগ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধ'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বেলা। তারপর হঠাৎ যেন তার কণ্ঠে বিস্ফোরণ হলো! 'এতই যদি জানো, তা হ'লে সেই দাদার স্ত্রীর মান-মর্যাদা বজায় রেখে চলার শোভনতাটুকু হারাও কি ক'রে, বুঝতে পারি না!'

'দাদার স্ত্রী হবার আগে যদি তোমার সঙ্গে কোনদিন আমার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হতো! থাক। চলে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। প্লিজ!' ব'লে হঠাৎ মুখটা তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিলে। তারপর কিসের যন্ত্রণা যেন বুকের মধ্যে চেপে নিতে নিতে জানলার কাছে সরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পরিতোষ। কিছুক্ষণ এইভাবে চুপ-চাপ থেকে শেষে আপন মনেই ব'লে উঠলো পরিতোষ, 'সবই আমার অদৃষ্ট! নইলে এতদিন পরে হঠাৎ তোমাকে নিজের বড় ভাইয়ের স্ত্রী রূপে দেখতে পাবো এবং তার জন্যে মনকে অন্য রকম ক'রে তৈরী করতে হবে—কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি!' আত্মগ্লানিতে যেন বুজে আসে পরিতোষের গলা!

'চুপ করো। উত্তেজিত হয়ো না ঠাকুরপো! দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়। অপরাধ আমাদের উভয়ের ভাগ্যের! নইলে এই দীর্ঘদিন, বছরের পর বছর যারা সংসারের বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ কেন এমন নাটকীয়ভাবে তারা আবার এক জায়গায় এসে মিলিত হলো! এ যে নভেল নাটকের চেয়েও বিস্ময়কর!' এই ব'লে হঠাৎ থেমে গেল বেলা।

পরিতোষ তেমনি নিশ্চুপ। যেন নৈশব্দের এক বিপুল সমুদ্রের

দু'পারে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে সর্বহারার মত! কিছুক্ষণ এমনি-ভাবে কাটবার পর কণ্ঠে মোলায়েম সুর টেনে বেলা বলে, 'ঠাকুরপো, যে নাটকের অভিনয় একদিন শেষ হয়ে গেছে, যার ওপর যবনিকা পতন হয়েছে, তার পুনরভিনয় না ক'রে আবার নতুন নাটকে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না?'

কি জবাব দেবে, বুঝি তাই ভাবছিল পরিতোষ। স্তব্ধ, নীরব, ও নিশ্চল মূর্তির মত।

ওদের মাঝের সেই নীরবতা ক্রমশ যেন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

বেলা এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল পরিতোষের কাছে। তার-পর পিছনের দরজার দিকে নিঃশব্দে একবার তাকিয়ে বুঝি দেখে নিলে কেউ এদিকে আছে কি না। সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। একটা পিন্ পড়লে বুঝি তার শব্দ পাওয়া যায়। তাদের বক্ষের প্রতিটি স্পন্দন যেন ধ্বনিত হচ্ছিল সেখানে। হঠাৎ বেলার মুখ থেকে নির্গত হলো, 'তুমি কি চাও না যে আমি সম্ভ্রমের সঙ্গে তোমাদের ঘরে থাকি? বলো, চুপ ক'রে থেকো না?' বেলার কণ্ঠ ধীর, স্থির, ও পাষাণের মত ভারী।

তখনো পরিতোষ তেমনি নীরব, তেমনি নিশ্চল। যেন ওর কথা কানে শুনতে পায় নি।

বেলা অপরাধিনীর মত কয়েক পা তার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর অনুতাপদগ্ধস্বরে ধীরে ধীরে সুরু করলে, 'তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি ভুলে যাও পূর্বের সব কিছু। মনে করো বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের জীবনে! তার সে গ্লানি মুছে ফেলো মন থেকে। পারবে না!'

এই জন্যে বুঝি আমায় অনুরোধ করেছিলে, 'এখানে এসে বাস করতে?'

'আমায় তুমি ভুল বুঝো না। সে কেবল আমি মার জন্যে বলেছিলুম!' তবু কথাটা বলতে গিয়ে তার বুকের মধ্যেটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে।

পরিতোষকে এবার আরো বেশী চিন্তাক্লিষ্ট দেখে এক পর্দা গলা চড়িয়ে দিলে বেলা, 'তুমি ত ভাগ্যবান! দেবরত্বের দাবীতে তোমার দাদার চেয়ে অনেক বেশি আদায় ক'রে নিচ্ছো আমার কাছ থেকে। তোমার কোন্ কাজটা আমি না করি! তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে সুরু ক'রে, চা, জলখাবার তৈরী, তোমার অপিসে বেরোবার জামা-কাপড় গুছানো, মায় খাটে বিছানা তৈরী করা পর্যন্ত! তা কি চোখে দেখে বুঝতে পারো না? এত লেখাপড়া শিখেছো তবে কি জন্যে!'

পরিতোষ এবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে গোপন ক'রে বললে, 'লেখাপড়া বেশি শিখেছি বলেই ত, তোমার মত এত সহজে সত্যকে মিথ্যা করতে পারছি না।'

'চুপ! দোহাই তোমার, ওসব কথা কানে শোনাও এখন আমার পক্ষে পাপ, তা কি জানো না! আজ দিব্যি ক'রে বলো, আর কোনদিন ওইভাবে আমার দিকে তাকাবে না। ভেবে দেখো, যদি কারুর চোখে পড়ে তা হ'লে তোমার যে বদনাম রটবে, তা আমি সহ্য করবো কেমন ক'রে!'

পরিতোষ জানলার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বেলার চোখের ওপর রাখতে রাখতে বললে, 'সব চেয়ে ভালো হয়, আমি যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই! সুন্দর ফুল ঈশ্বরের দান; অন্যের বাগানে ফুটেছে ব'লে তার দিকে তাকাতেও পারবো না—সে অধিকারও আমার নেই!'

'আমি তোমার মত এত লেখাপড়া শিখি নি, ভালমন্দ কথা গুছিয়ে বলতে পারবো না এমন ক'রে। তবে যা অন্যায় তা আমি কিছুতেই

তোমায় করতে দেবো না ঠাকুরপো!' ব'লে বেলা যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতে গেল, পরিতোষ অমনি বললে, 'বেশ, তাই হবে আজ থেকে।'

এরপর আর কোনদিন কোন কিছু বেচাল অবশ্য দেখে নি বেলা পরিতোষের মধ্যে। বরং দূরে থেকে সে তার প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতো! তাই হঠাৎ আবার এতদিন পরে বড়জায়ের মুখে ওই কথা শুনে তার মনে কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো! তবে কি পরিতোষের মধ্যে আবার ধীরে ধীরে তাকে পাবার লালসা জাগছে? হয়ত সে ভাবছে, পথ নিষ্কণ্টক, জোর ক'রে যদি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা যায়। কিংবা যদি কোনদিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, সেই শুভক্ষণটির জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে!

রাগে সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধ'রে যায় বেলার। ছিঃ এত অভদ্র পরিতোষ! ভাবে, পরিতোষকে এবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে যে তেমন মেয়ে অন্ততঃ বেলা নয়। কুমারী জীবনে কবে কি ছেলেখেলা করেছে কার সঙ্গে সেটা তার আসল পরিচয় নয়। বিবাহিত জীবনটাই মেয়েদের কাছে সত্য ও ধ্রুব। খেলাঘরের সঙ্গে যে বাস্তব জীবনের প্রভেদ আকাশ পাতাল, সে যেন এ কথাটা ভুলে না যায়।

কিন্তু মনের মধ্যে এ ব্যাপার নিয়ে যত সম্ভব অসম্ভব পরিকল্পনা করতে থাকে বেলা ততই যেন ভেতরে ভেতরে কিসের একটা দুর্বলতা বোধ করে। অবশেষে সে আর সামলাতে পারলে না নিজেকে। কেঁদে ফেললে বড় জায়ের কাছে। বললে, 'এর পর আর এখানে থাকা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় দিদি। তুমি শ্বশুর ঠাকুর ও শাশুড়ী ঠাকরুণকে ব'লে আমায় মার কাছে পাঠিয়ে দাও ভাই। আমি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবো!'

'সেখানে গেলেই যেন নিস্তার পাবি পুরুষের হাত থেকে!' ব'লে

একটু বাঁকা কটাক্ষ করলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা আমি আজ-ই বাবা মাকে বুঝিয়ে বলছি। তোর এ প্রস্তাবটা একদিক থেকে খুবই ভাল।'

সত্যি, বেলার কথাটা শুনে বিশেষ ক'রে বেলার শ্বশুর, শাশুড়ী ওকে খুবই উৎসাহ দিলেন। ওর শ্বশুর মশায় বললেন, 'তার চেয়ে তুমি মা আবার লেখাপড়াটা শুরু করো। ম্যাট্রিকটা ত পাশ করেছো। এবার কলেজে ভর্তি হও, তোমার পড়াশুনার জন্যে যা কিছু খরচ-খরচা সব আমি দেবো। মায়ের কাছে থেকে খুব মন নিবিষ্ট ক'রে লেখাপড়াটা শিখে ফেলো। তাতে তোমার ও আমাদের বংশের মুখ একসঙ্গে উজ্বল হয়ে উঠবে। তুমি মহীতোষের মত অধ্যাপকের স্ত্রী, মনে রেখো মা!'

শ্বশুর মশায় নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে বেলাকে তার মায়ের কাছে উল্টোডিঙ্গিতে রেখে এলেন। কেন না একদিন তিনি-ই জোর ক'রে তাকে নিজের ঘরে রেখেছিলেন এবং বেলার মাকে তখন এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, 'ও আমার ছেলের বৌ নয়—আমার মেয়ে। ওর সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।'

সেদিন তাই ওর যাবতীয় খরচা দিয়ে বেলাকে তার মায়ের কাছে রেখে আসবার সময় তিনি বললেন, 'এখানে কোন ঝামেলা নেই। আপনার কাছে থাকলে একমনে লেখাপড়া ভাল শিখতে পারবে।'

সত্যি বেলাকে তিনি-ই কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন। এবং তার হাত-খরচের জন্যে প্রত্যেক মাসে কুড়ি টাকা ক'রে অতিরিক্ত পাঠাতেন।

বেলা তখন মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিল, যতদিন না পরিতোষ

প্রায়শ্চিত্ত করছে তার কাছে নিজে এসে মাপ চেয়ে, ততদিন আর শ্বশুরবাড়িতে সে পদার্পন করবে না কিছুতেই !

এদিকে বেলার মা মেয়ের যাতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে মতি থাকে সেইজন্যে পূজা-আর্চা, বারব্রত, উপবাস প্রভৃতি বৈধব্য জীবনের কঠোর অনুশাসনগুলিকে মেনে চলতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুর ঘরের বিধবা, যত আচারপরায়না হবে, যত নিষ্ঠাবতী হবে, ততই মঙ্গল।'

সত্যি, বেলার মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মেয়ের কঠোর সংযম দেখে। মায়ের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে সে বৈধব্যের কঠোর অনুশাসনগুলি একের পর এক পালন ক'রে চলে।

মেয়ের এই অতি ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে মনে মনে তিনি ইষ্টদেবের চরণে প্রার্থনা জানান, 'ঠাকুর ওর মন যেন ধর্মপথে অবিচলিত থাকে।'

ওদিকে পরিতোষকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন তার বাড়ির লোকেরা। যত সম্বন্ধ আসে ওর বিয়ের, কিছুতেই সে রাজী হয় না।

মা, বাপ, পেড়াপীড়ি করেন না—তবে দুশ্চিন্তায় দিন কাটান।

মাঝে মাঝে বৌমার খবর নিতে এসে, গম্ভীর মুখে তিনি বেলার কাছে ছোট ছেলের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন। 'কি জানি মা, ওর কি মনের কথা। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অনেককে দিয়েই ত বলিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয় না। বড় বৌমা, ওর মা, অনেকরকম ক'রে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও ওর মনের গভীরে যে কি লুকনো আছে, তা বার করতে পারে না।'

শ্বশুরকে বিদায় দিয়ে, পড়ার টেবিলে চুপচাপ বসে থাকে বেলা অনেক রাত পর্যন্ত। সামনে বইয়ের পাতা খোলা পড়েই থাকে—ওর মনটায় বার বার সেই একটা প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসে, 'পরিতোষ বিয়ে করতে রাজী নয় কেন? তবে কি তাকেই সে—ছি ছি।' এর বেশি

আর কল্পনা করতেও যেন ঘেন্না করে বেলার। তবু তার মনের মধ্যে সব সময় একটা কিসের ঔৎসুক্য যেন বিঁধে থাকে কাঁটার মত।

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। বেলা একটার পর একটা পরীক্ষার গণ্ডি উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে। সসম্মানে আই, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে এবার ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হলো এম, এ পড়ার জন্যে। ফিফ্‌থ ইয়ারটা তখনো সম্পূর্ণ হতে বাকী হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে বাড়ী ঢুকতে গিয়ে বেলা শুনলে, তার শ্বশুরমশায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে একখানা ছাপানো বিয়ের চিঠি তার মায়ের হাতে দিয়ে বলছেন, 'অনেক কষ্টে ছেলে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কবে তা হ'লে বৌমাকে এসে নিয়ে যাবো ?'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র বেলার বুকের মধ্যেটা যেন কেঁপে ওঠে! সহসা মনে পড়ে যায় তার প্রতিজ্ঞার কথা। পরিতোষ নিজে এসে মাপ চেয়ে না নিয়ে গেলে সে যাবে না কিছুতেই সেখানে।

তখনো বিয়ের পনেরো দিন বাকী! তাই বেলা বই খাতাগুলো হাতে নিয়েই ঘরে ঢুকলো। এবং শ্বশুরমশাইকে নমস্কার করতে করতে বললে, 'একটা ভাল দিন দেখে ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তার সঙ্গে চলে যাবো!'

'আচ্ছা, মা। সেই ভাল।' ব'লে বৃদ্ধ বিদায় নিলেন সেদিন বটে কিন্তু তার তিনদিন পরে বেলা বড় জায়ের একখানা দীর্ঘ চিঠি পেলে। 'ঠাকুরপোর আনতে যাবার সময় হবে না। অপিসের কাজ না কি ওঁর এখন এত বেড়েছে যে সকাল সকাল অপিস থেকে বেরুতে পারে না। তাই আগামী শনিবার, বাবা নিজেই যাবেন তোমায় আনতে। দুপুরে বেলা দেড়টা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত সময় খুব ভাল, তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো!'

চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো।

পড়ার ঘরে গিয়ে চুপি চুপি চিঠিখানা আরো দু'তিনবার সে পড়লে। কিন্তু যত পড়ে তত যেন মাথার মধ্যে কিসের এক উত্তাপ বাড়তে থাকে। কেন, তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন!

সেদিন সারারাত তার চোখে ঘুম এলো না।

পরের দিন সকাল থেকে দুপুর কেটে গেল বেলার ঠাকুর ঘরে। গীতার কয়েকটা অধ্যায় বার বার পড়েও যেন তার মন সুস্থির হয় না। যন্ত্রণার মত কি এক চিন্তাকে কিছুতেই যেন মন থেকে তুলে দূরে ফেলে দিতে পারে না। সেদিন বেলা ভাল ক'রে খেলে না। ইউনিভার-সিটিতে পড়তেও গেল না। ইট-বার-করা পুরানো লোনাধরা বাড়িটার চিলে কোঠায় গিয়ে গুম্ খেয়ে বসে রইল। মা জিজ্ঞেস করতে জবাব দিলে, 'শরীরটা খারাপ কিছু ভাল লাগছে না!

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁরও মনে কেমন যেন আতঙ্ক জাগে। বলেন, 'কিরে শরীর যদি বেশী খারাপ বুঝিস্ তা হ'লে বল, ডাক্তারকে খবর দিই। আর ক'টা দিন আছে তোর দেওরের বিয়ের, ওরা হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই নিতে আসবে। তখন আবার অসুখ টসুখ না হয়ে পড়ে। তাই বলছি কি, একবার গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে আয়!'

পরের দিন ইউনিভারসিটি থেকে বেলা আর বাড়ি ফিরলো না। মাকে শুধু একখানা চিঠি লিখে পাঠালে, 'আমি কলেজের একটি ছেলেকে বিয়ে করেছি। সে ব্রাহ্মণ নয় ব'লে তুমি রাগ করো না। আমি মনেব সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আর পারলুম না। তাই এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হলুম। তুমি আশীর্বাদ করো। ইতি তোমার হতভাগিনী মেয়ে বেলা।'

এই ছেলেটি আর কেউ নয় সেই বিশ্বজিৎ। কেন তাকে হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসলো বেলা, তা কেউ জানে না।

স্বপ্নের মত নিজের জীবনের অতীত এই সব চিত্রগুলি একটার পর একটা দেখতে দেখতে একসময় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো বেলা।

পরের দিন সকালে 'ব্রেক ফাস্ট' খেতে গিয়ে টেবিলে বসে কেবলি দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন আশুবাবু। বেলা কৈ? তার সেই নবলব্ধ স্বামীটিকেও দেখছেন না কেন! একে একে দু'য়ে দু'য়ে সবাই ত টেবিলে খেতে এলো, ওরাই বা আসছে না কেন!

খাওয়া শেষ হ'লে আশুবাবু হোটেলওয়ালীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাদের খবর। বললেন, 'ওরা খেতে এলো না কেন?'

হোটেলওয়ালী তার মুখ থেকে আধপোড়া সিগারেটটা টেনে নিয়ে বললেন, 'তারা আজ সকালেই যে চলে গেছে।'

'চলে গেছে!' আশুবাবুর মুখ দিয়ে শুধু ওই কথাটি একবার মাত্র বার হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। যেন কি একটা বড় প্রত্যাশা থেকে কে তাকে বঞ্চিত করলে!

আশুবাবু নিজের ঘরে ফিরে এসে বারান্দা থেকে চেয়ারটা নামিয়ে আনলেন বালির ওপর। তারপর প্রতিদিনের অভ্যাসমত সেখানে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঢেউয়ের পর ঢেউ প্রতিদিনের মত সেদিনও এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল তাঁর পায়ের একেবারে কাছে, স্বল্প দূরে। শিশির-বিন্দুর মত ছিটকে আসা শিকর কণাগুলিকে মুখ থেকে মুছে ফেলতে ফেলতে বুঝি তিনি তখনো আগের মতই চিন্তা করছিলেন। তবে প্রতিদিনের চিন্তার সঙ্গে আজকের শুধু এইটুকু পার্থক্য, কেন কে জানে, বারবার ঘুরে ফিরে কেবলি তাঁর মনে হচ্ছিল, হয়ত বেলা ঠিকই করেছে, তিনি ভুল করেছেন।